পঞ্চ রোমাঞ্চ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

বই লাভার'স পোলাপাইন

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

পরিচিতি

জ্যাক ফিনের অভ মিসিং পার্স·ন্স্-এর ছায়া অবলম্বনে লেখা হয়েছে 'অন্য কোনোখানে', ম্যান রুবিনের আ নাইস টাচ অবলম্বনে লেখা 'পরকীয়া', লয়েড বিগ্‌ল, জুনিয়ারের আ স্লাইট কেস অভ লিম্বো-র অনুপ্রেরণায় লেখা হয়েছে 'ক্যান্সার', হেনরী কুটনারের পাইল অভ ট্রাবল-এর ভাব অবলম্বনে সৃষ্টি হয়েছে 'ঝামেলা'র এবং জি. কে. চেস্টারটনের 'দ্য ব্লু ক্রস'-এর কাঠামো নিয়ে তৈরি হয়েছে উপন্যাসিকা 'ওস্তাদ'।

পঞ্চ রোমাঞ্চ
প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৫

অন্য কোনোখানে

ঢুকে মনে হবে, এটা আর দশটা ট্র্যাভেল এজেন্সির মতই সাধারণ একটা অফিস,' আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিল মাতাল লোকটা। 'কিন্তু ঘাবড়াবেন না। সাদামাটা দু'চারটে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করবেন: এই ধরুন, ছুটি, কোথাও বেড়াতে যেতে চান, কোথায় গেলে ভাল হয়, এই রকম সাধারণ দু'একটা প্রশ্ন। তারপর সেই ফোল্ডারের ব্যাপারে সামান্য একটু আভাস দেবেন। সামান্য। যাই করুন না কেন, সরাসরি ওটার কথা কিন্তু বলবেন না: যতক্ষণ না নিজে থেকে কথা তুলবে, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ধৈর্য ধরে। যদি দেখালো, তো জানলেন, কপাল ভাল আপনার। আর যদি চেপে যায়, তো জানবেন, ওটা দেখার সৌভাগ্য হবে না আপনার কোনদিনই। যদি পারেন, ভুলে যাবেন। বুঝতে হবে, আপনাকে পছন্দ হয়নি ওদের। সরাসরি প্রশ্ন করেও কোন লাভ নেই, বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে আপনার চোখের দিকে, যেন কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছে না।'

হাঁটছি। উনিশে শ্রাবণ। মঙ্গলবার। ঝরঝর ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম, কখনও হালকা, কখনও জোর, কখনও সোজা, কখনও বাঁকা হয়ে। ছাতাটা এদিক-ওদিক বাঁকিয়ে যতটা সম্ভব বাঁচবার চেষ্টা করছি বৃষ্টির ছাট থেকে। চুপচুপে হয়ে ভিজে ভারি হয়ে গেছে জুতো জোড়া। দিলকুশা কমার্শিয়াল এরিয়া যত কাছে আসছে ততই কমে আসছে আমার চলার গতি। কেমন ভাবে কী বলব, কীভাবে শুরু করব, কীভাবে ইঙ্গিত দেব বারবার করে মনে মনে ভেঁজে নিয়েছি আমি: কিন্তু যতই সেই দালানটার কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর সন্দেহ এসে ভিড় করছে মনের মধ্যে, যুক্তি-তর্ক আর বাস্তব-বুদ্ধি পিন ফোটানোর চেষ্টা করছে আমার বিশ্বাসের বেলুনে। নিজেকে বোকা বোকা লাগছে। আধ বোতল বাংলা মদ পেটে পড়বার পর রাতের বেলায় এক ঝুপড়ির মধ্যে টুলে বসে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মাতালের কথা যতটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল, এই বিকেলে অফিস সেরে ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে কাদা আর গাড়ির ছিটে বাঁচিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ততটা আর মনে হচ্ছে না। এই রকম একটা ব্যাপার বিশ্বাস করা কঠিন। বার কয়েক

ভাবলাম, ফিরে যাই; কিন্তু এতদূর এসে ফিরে গেলে আবার খুঁতখুঁত করবে মনটা, ভাবলাম, তার চেয়ে প্রায় এসেই যখন পড়েছি, সত্য-মিথ্যা যাচাই করে ফেরাই ভাল।

এগোচ্ছি, কিন্তু সন্দেহের দোলা লাগছে মনের মধ্যে। ভাবছি, যদি ওরকম একটা পুস্তিকা থেকেও থাকে, আমি কে? আমাকে দেখাতে যাবে ওরা কোন্ দুঃখে? নাম?—যেন প্রশ্ন করা হচ্ছে, এমনি ভাবে নিজেই জিজ্ঞেস করলাম নিজেকে। নিজেই উত্তর দিলাম: খালেক। আবদুল খালেক। বি. কম. পাস—এ. জি. বি. অফিসে কাজ করি, টাইপিস্ট। ইংরেজি না, বাংলা মুদ্রাক্ষরিক। বাড়ি? কুমিল্লা। বাসা? বাসা··· বাসা নেই, মেসে থাকি, সেক্রেটারিয়েটের দক্ষিণে, রেলওয়ে কলোনিতে। চাকরি করতে ভাল লাগে না আমার···কিছুই ভাল লাগে না, যা টাকা পাই দেশে একশো পাঠিয়ে খরচ কুলাতে চায় না। কোনদিন স্বচ্ছলতা আসবে না আমার, আমি জানি। একই পদে চাকরি করছি আজ চার বছর। উন্নতি নেই, হবেও না। বন্ধু-বান্ধব বলতে কেউ নেই আমার, এই বিরাট ঢাকা শহরে আমি সম্পূর্ণএকা। আর কি বলার আছে আমার?—মাঝে মাঝে সিনেমা দেখি, কিন্তু মজা পাই না, মাসের প্রথম দিকে এক-আধটা বই কিনি, সারা মাস সেটাই উল্টাই— পাল্টাই। একঘেয়ে··· সময় কাটতে চায় না। সত্যিই, কিছুই ভাল লাগে না আমার। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই খাবার খেয়ে চলেছি আমি একই থালায়, একই পিঁড়িতে বসে, স্বাদ বদলের সঙ্গতি নেই। চেহারায়, চলায়, বলায়, কাজে, চিন্তায় আমি নিতান্তই সাদামাটা, সাধারণ এক যুবক। আপনাদের পছন্দ হবে আমাকে? মানে, আপনাদের বিবেচনায় আমাকে যোগ্য বলে··· মানে, নিচ্ছেন?

দূর থেকেই ছোট্ট সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল আমার। রাস্তার ডানধারে। চারতলার উপর। খোলা জানালা দিয়ে ঝকঝকে আলো দেখা যাচ্ছে ভিতরে।

অস্বস্তি বোধ করলাম-চুপচুপে ভেজা জুতো, ইস্ত্রিবিহীন জামাকাপড়, শিক-বাঁকা পুরানো ছাতা নিয়ে ওখানে হুট করে ঢুকে পড়াটা কি ঠিক হবে? প্রথম দর্শনেই যদি বাতিল করে দেয়? আজই ঢুকব, নাকি পরে কোনও একদিন ···নাহ্ এসেই যখন পড়েছি···

ছাতাটা বন্ধ করে উঠে পড়লাম লবিতে। দেয়ালের গায়ে আঁটা রয়েছে ত্রিশ-চল্লিশটা ছোট-ছোট চৌকোণ কাঠের নেমপ্লেট, তাতে বিভিন্ন কোম্পানির নাম লেখা। চট করেই পেয়ে গেলাম, 'ড্রিম ট্র্যাভেল এজেন্সি, থার্ড ফ্লোর'। মোজাইক করা টালির উপর ছাতা থেকে কুলকুল করে নেমে আসা পানি যতটা সম্ভব ঝরিয়ে নিয়ে চাপ দিলাম এলিভেটরের বোতামে। 'কোঁক' করে শব্দ হলো উপরে কোথাও। পাপোশের উপর আচ্ছামত ঘষে জুতোজোড়া পরিষ্কার করে নিলাম। সড়সড় করে নেমে আসছে এলিভেটর। কেন জানি, হঠাৎ ভয় হলো; ইচ্ছে হলো—দূর, থাক, চলে যাই। ফিরতে যাচ্ছিলাম, এমনি সময় খুলে গেল এলিভেটরের সবুজ দরজা, একজন লোক ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে এল ওর মধ্যে থেকে, আমি ঢুকলাম। আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কয়েক সেকেণ্ড হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে টিপে দিলাম তিন নম্বর বোতামটা। মৃদু একটা গুঞ্জন

ধ্বনি তুলে উপরে উঠতে শুরু করল এলিভেটর, সোজা এসে থামল চারতলায়, দরজা খুলে যেতেই বেরিয়ে এলাম করিডোরে। ঠিক সামনেই ড্রিম ট্র্যাভেল এজেন্সির পিতলের ফ্রেমে বাঁধানো কাঁচের দরজা।

বাইরে থেকেই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল: প্রশস্ত ঘর, উজ্জ্বল ফ্লুরেসেন্ট আলোয় আলোকিত। ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্লাস্টিক-পেইন্ট লাগানো দেওয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো বিভিন্ন দেশের টুরিস্ট ব্যুরো আর বিমান কোম্পানির মস্ত সব রঙিন পোস্টার। কাউন্টারের ওপাশে খোলা জানালার ধারে টেলিফোনের রিসিভার কানে ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বা, সুদর্শন, সুবেশী পুরুষ। গম্ভীর। কাঁচাপাকা জুলফি। চোখ তুলে আমাকে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে ভিতরে ঢুকবার ইঙ্গিত করল লোকটা। ভিতর ভিতর চমকে গিয়েছি আমি, ধুপধাপ লাফাতে শুরু করে দিয়েছে হৃৎপিণ্ডটা—ঠিক এই চেহারাই বর্ণনা করেছিল মাতাল লোকটা!

কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকতে চেষ্টা করলাম, পরে দেখলাম, 'পুশ' নয়, 'পুল' লেখা আছে কাঁচের গায়ে। ঢুকে পড়লাম ভিতরে। 'হ্যাঁ, বিওএসি,' বলছে লোকটা ফোনে। 'ফ্লাইট সেভেন ও ফাইভ··· বুকিং কমপ্লিট, কনফার্মড। ...সময়?' কাঁচ ঢাকা কাউন্টারের উপর নজর বুলিয়ে বলল, 'সিক্সটিন আওয়ার্স। তবে আপনি তিনটের মধ্যে পৌঁছে যাবেন এয়ারপোর্টে।···একযাক্টলি···রাইট, থ্যাংকিউ।'

কাউন্টারে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছি, চারদিকে নজর বুলিয়ে দমে যাচ্ছি ক্রমে। এই লোকই—তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অফিসটা যে আর-সব ট্র্যাভেল এজেন্সির মতই, প্রায় হুবহু এক, তাতেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কাঁচ ঢাকা কাউন্টারের একপাশে অবিকল প্লেনের মত ছোট-ছোট কয়েকটা উড়োজাহাজের মডেল রাখা, চওড়া একটা স্টিলর‍্যাকে থরে থরে ফোল্ডার সাজানো, কাঁচের নিচে ছাপানো শিডিউল। প্রত্যেকটা জিনিস পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সত্যি সত্যিই এটা একটা ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিস, আর ব্যাপারটা যতই স্পষ্ট হচ্ছে ততই বোকা মনে হচ্ছে আমার নিজেকে।

'বলুন, আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?' সুশ্রী, লম্বা লোকটা ফোন নামিয়ে রেখে আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল।

ভয়ানক নার্ভাস লাগল। মনে হচ্ছে, জোর পাচ্ছি না হাঁটুতে। লোকটার চোখের দিকে চাইতে পারলাম না। আমতা আমতা করে বললাম, 'আমি···আমি কোথাও চলে যেতে চাই।' বলেই বুঝতে পারলাম একটু বেশি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। গর্দভ!—নিজেকে বললাম, তাড়াহুড়ো করতে যেয়ো না। আমার উত্তর শুনে লোকটার কি প্রতিক্রিয়া হয়, লক্ষ করবার চেষ্টা করলাম আতঙ্কিত দৃষ্টিতে। আশা করছিলাম, এই বুঝি ধমকে উঠবে লোকটা, কিন্তু না, চোখের পাপড়ি পর্যন্ত ফেলল না সে, হাসিটা মলিন হলো না একটুও।

'অনেক জায়গা আছে,' খুশি-খুশি গলায় বলল সে। 'যাওয়ার জায়গার অভাব নেই। কোনদিকে যেতে চান আপনি?' কক্সবাজার, কাপ্তাই, রাঙামাটি, বগুড়া—নানান জায়গার কয়েকটা ফোল্ডার বিছিয়ে দিল লোকটা কাউন্টারের উপর। ট্যুরিস্টদের মন ভুলাবার জন্যে রঙচঙা হরেক রকম ছবি; আসলে যেমন, তারচেয়ে

অনেক সুন্দর দেখতে।

ভদ্রতার খাতিরে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম আমি ছবিগুলোর দিকে, তারপর আস্তে মাথা নাড়লাম। কথা বলতে ভরসা পাচ্ছি না, পাছে কোন্ কথায় কী বলে বসি, ভুল হয়ে যায়।

যেন আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছে এমনি ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লোকটা। বলল, 'ও, দেশের বাইরে কোথাও যেতে চান বুঝি? দেখুন দেখি, পছন্দ হয় কি না?' প্যান অ্যামের একটা লম্বা ফোল্ডার বের করল সে, তার উপর আড়াআড়িভাবে লেখা: ফ্লাই টু বুয়েনাস আইরেস—অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড! নিচে সুন্দর একটা ছবি: অপূর্ব আলোকসজ্জায় সজ্জিত এক বন্দরে নেমে আসছে একটা রূপোলি উড়োজাহাজ, চাঁদের আলো ঝিলমিল করছে সাগর জলে, পিছনে পর্বতের আভাস। 'কিংবা বারমুদা? এই সময়টায় অপূর্ব!'

সিদ্ধান্ত নিলাম, ভুল হয় হোক, খানিকটা ঝুঁকি নেয়াই ভাল। মাথা নেড়ে বললাম, 'না। ওসব না, অন্য কোথাও যেতে চাই আমি। নতুন কোন জায়গা, যেখানে স্থায়ীভাবে বাস করা যায়।' কথাটা বলতে বলতে সোজা লোকটার চোখের দিকে চাইলাম। 'বাকি জীবন যেখানে থাকতে পারি।' এটুকু বলেই ঘেমে উঠলাম আমি। প্রয়োজন হলে কথা ঘুরাবার কোন রাস্তা রাখিনি আর।

কিন্তু আমার বক্তব্য শুনে অবাক হলো না লোকটা, মাথা ঝাঁকাল মরমী বন্ধুর মত, মিষ্টি হেসে বলল, 'সে ব্যাপারেও আশা করি আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব।' সামনে ঝুঁকে কাউন্টারের উপর কনুই রাখল, দুই হাত জোড়া করে তার উপর রাখল চিবুক, যেন কোন তাড়া নেই তার, আমার জন্যে সময় ব্যয়ে কোন আপত্তি নেই। 'ঠিক কী খুঁজছেন আপনি বলুন তো? কী চান?'

উৎকণ্ঠায় দম আটকে আসতে চাইছে আমার। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে বললাম, 'পালিয়ে যেতে।'

'কীসের থেকে?'

'সবকিছু...' একটু ইতস্তত করলাম। সত্যি বলতে কি, এসব কথা পরিষ্কার ভাবে ভাবিনি আমি কোনদিন। 'এই ধরুন ঢাকা থেকে, না, এই দেশ থেকেই। আসলে যে-কোন দেশ থেকে। উদ্বেগ থেকে, ভয় থেকে, উৎকণ্ঠা থেকে। কাগজে যেসব খবর পড়ি, সেসব থেকে। ক্লান্তি থেকে। হীনম্মন্যতা থেকে। নিঃসঙ্গতা থেকে।' বলতে বলতে মুখ ছুটে গেল আমার। ঠিক যতটা উচিত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলছি আমি জানি, কিন্তু থামতে পারলাম না। 'যা চাই, তা করতে না পারার আফসোস থেকে, বিষণ্ণতা থেকে, একঘেয়েমি থেকে; আয়ুর বেশির ভাগ সময় শুধু খেয়ে বেচে থাকার প্রয়োজনে বিক্রি করে দেয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে। আসলে হয়ত বলতে চাই, জীবন থেকে—মানে, এখানে জীবন বলতে যা বোঝায়, তা থেকে।' আবার সরাসরি চাইলাম লোকটার চোখের দিকে। ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললাম, 'এই দুনিয়া থেকে।'

ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল লোকটা আমার দিকে। গম্ভীর। তীব্র দৃষ্টিতে দেখল সে আমাকে কাউন্টারের ওপাশ থেকে যতটা দেখা যায়। প্রতিমুহূর্তে আশা করছি এক্ষুণি মাথা নেড়ে বলে উঠবে: জনাব, কেটে পড়ুন।

আপনার চিকিৎসার দরকার। কিন্তু সে-কথা বলল না লোকটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার কপালটা লক্ষ্য করছে সে এখন। কাঁচাপাকা জুলফি চুলকাল বাম হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে। এতক্ষণে ভাল করে লক্ষ করলাম আমি লোকটার মুখ। ক্ষুরধার বুদ্ধির ছাপ রয়েছে সে মুখে, আর রয়েছে আশ্চর্য এক দয়ালু ভাব—ঠিক যেমনটা সবাই আশা করে তার বাবার মধ্যে, ধর্মগুরুর মধ্যে, জগৎপিতার মধ্যে।

দৃষ্টিটা আমার চোখে এসে স্থির হলো, তারপর নাক, মুখ, চিবুক, প্রত্যেকটা জিনিস পরীক্ষা করে দেখল সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। আমি টের পেলাম, নিজের সম্পর্কে আমি যতটা জানি তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে নিল লোকটা এই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই। হঠাৎ মুচকি হাসল সে। সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আপনি মানুষকে ভালবাসেন? সত্যি কথাটা বলুন, কারণ সত্য-মিথ্যা বুঝতে পারব আমি।'

'বাসি। যদিও লোকজনের সামনে ঠিক সহজ হতে পারি না, নিজেকে ঠিক প্রকাশ করতে পারি না, যার ফলে আমার বন্ধু প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু মানুষকে আমি সত্যিই ভালবাসি।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। মেনে নিল কথাটা। 'আপনার কী ধারণা নিজের সম্পর্কে? মোটামুটি ভাল লোক আপনি?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'কেন? কীভাবে?'

কী উত্তর দেব ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। কঠিন প্রশ্ন! ভেবেচিন্তে বললাম, 'এইজন্য বলছি যে, যদি খারাপ কিছু করে ফেলি, সাধারণত সেজন্য অনুশোচনা হয় আমার।'

কথাটা নিজের মনে নেড়েচেড়ে দেখল লোকটা কয়েক সেকেণ্ড, তারপর যেন একটা প্রায়-অশ্লীল রসিকতা করতে যাচ্ছে এমনি ভাব নিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে আপনারই মত এক আধজন আসেন আমাদের কাছে, আপনি যা চাইছেন প্রায় এই ধরনের চাহিদা নিয়েই। তাঁরাও সব ছেড়ে চলে যেতে চান অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। তাই আমরা নিছক রসিকতার খাতিরেই...'

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি আমি। আমাকে যদি পছন্দ হয় তা হলে ঠিক এই কথাগুলোই বলবে, বলেছিল মাতাল লোকটা! পালস রিট বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে আমার।

'...আজগুবি এক ফোল্ডার তৈরি করিয়েছি। ব্যাপারটা নিছক তামাশা, বুঝতে পেরেছেন? শুধু মজা করার জন্যেই ছাপিয়েছি আমরা পুস্তিকাটা। সবার জন্য নয়, তাছাড়া ওটা এখান থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ারও নিয়ম নেই; তবে আপনি, যদি আগ্রহ বোধ করেন, দেখতে পারেন ওটা।'

চাপা গলায় প্রায় ফিসফিস করে বললাম, 'দেখব!'

কাউন্টারের নিচের একটা তাক ঘেঁষে একটা ফোল্ডার বের করে আনল লোকটা, কাঁচের উপর রেখে ঠেলে দিল আমার দিকে।

কাছে টেনে নিলাম আমি ওটা। ঘন নীল রঙের কাভার, ঠিক রাতের আকাশের রঙ। সাদা অক্ষরে লেখা রয়েছে: ভার্না। কাভারের সবটা জুড়ে ফুটিফুটি অসংখ্য তারকা আঁকা। লেখাটার ঠিক পাশেই একটা উজ্জ্বল তারা দেখা যাচ্ছে,

চারদিকে আলোর বিচ্ছুরণ বেরোচ্ছে ওটা থেকে। পাতাটার নিচের দিকে খুব ছোট অক্ষরে লেখা: স্বপ্নের দেশ, শান্তির দেশ—ভার্না! জীবন এখানে ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, তেমনি। তার পাশে পাতা উল্টাবার ইঙ্গিতে দেয়া হয়েছে মোটাসোটা একটা বেঁটে তীরের সাহায্যে।

পাতা উল্টালাম। সাধারণ আর দশটা ফোল্ডারের মতই ভিতরে হরেক রকম ছবি, লেখা। তফাৎ শুধু প্যারিস, রোম কিংবা বাহামা না হয়ে এতে যা কিছু রয়েছে সবই ভার্না সম্পর্কে। আর্ট বোর্ডের উপর অপূর্ব সুন্দর ছাপা, ছবিগুলো মনে হচ্ছে একেবারে জীবন্ত। থ্রি-ডাইমেনশন রঙীন ছবি যেমন, তেমনি—কিংবা তার চেয়েও সজীব। একটা ছবিতে ঘাসের উপর শিশির জমে আছে এক ফোঁটা, মনে হচ্ছে সত্যিই, ছুঁলে হাতে পানি লাগবে। আরেকটায় বাঁকাভাবে দেখা যাচ্ছে বিশাল এক গাছের গুঁড়ি, নিখুঁত—কর্কশ বাকলের গায়ের এবড়োখেবড়ো ভাঁজ এতই জীবন্ত মনে হচ্ছে যে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে যখন দেখলাম মসৃণ কাগজ, তখন কেমন যেন ধাঁধা লেগে উঠল। আরেকটা ছবিতে কয়েকজন মানুষের মুখ, ঠোঁটগুলো ভেজা ভেজা, চকচক করছে চোখের মণি, হাসি হাসি মুখ, খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয় এক্ষুণি কথা বলে উঠবে।

পাতা উল্টালাম। পাশাপাশি দুই পৃষ্ঠার মাথার দিকে তিন ইঞ্চি জুড়ে বড় একটা ছবি। মনে হচ্ছে পাহাড়ের উপর থেকে তোলা হয়েছে ছবিটা। আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি পাহাড়টার মাথায়। পায়ের কাছ থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাহাড়, মিশেছে গিয়ে উপত্যকায়, বহুদূরে আবার একটা পাহাড়ের আভাস, ক্রমে উঁচু হচ্ছে জমিটা। পাহাড়ের গায়ে অপূর্ব সুন্দর জঙ্গল, সবুজ হয়ে আছে মাইলের পর মাইল। বহু নিচে উপত্যকা বেয়ে একেবেঁকে বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ি নদী, আকাশের নীল ছায়া নদীর বুকে, মাঝেমাঝে এক-আধটা বিশাল পাথরের চাঁই দেখা যাচ্ছে নদীর মাঝখানে, তার আশেপাশে সাদা ফেনা। ভাল করে ঠাহর করলে মনে হয় জীবন্ত হয়ে উঠেছে নদীটা, কুলকুল ছুটছে দুর্বার, ছোট ছোট ঢেউয়ের গায়ে সূর্যের কিরণ। নদীর ধারে বেশ অনেকগুলো দোচালা চৌচালা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, কোনটা কাঠের, কোনটা ইঁটের—সবগুলোই ছিমছাম, সুন্দর। ছবির নিচে শুধু একটা শব্দ লেখা: স্বপ্ননীড়।

'সুন্দর না?' কথা বলে উঠল কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো লোকটা। 'তামাশা হোক আর যাই হোক, একঘেয়েমি দূর হয়ে যায়, তাই না? কেমন লাগছে দেশটা?'

'অপূর্ব!' কোনমতে উচ্চারণ করলাম কথাটা, কিন্তু চোখ সরাতে পারলাম না ছবি থেকে। সত্যিই অপূর্ব। একেবারে স্বপ্নের মত। চোখে যতটা দেখছি তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝতে পারছি ছবি থেকে, অনুভব করতে পারছি, নির্মল এখানকার আবহাওয়া, বুক ভরে শ্বাস টানলে শুধু বাতাস নয়, শান্তি এসে যাবে বুকের মধ্যে।

এই ছবিটার নিচেই আরেকটা ফটোগ্রাফ। সাত-আটজন জটলা পাকিয়ে বসে আছে সমুদ্র, নদী বা লেকের ধারে। দুটো বাচ্চাও দেখা যাচ্ছে, খেলছে আপন মনে। সবাই হাসিখুশি, সবার হাতেই চা কিংবা কফির কাপ, কারও কারও হাতে

জ্বলন্ত সিগারেট, একজনের দাঁতের ফাঁকে পাইপ। রোদ আর ছায়া দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সময়টা সকাল। নিশ্চিন্তে ঘুম দিয়ে ওঠায় তাজা, সজীব একটা ভাব প্রত্যেকের চোখে মুখে। বোঝা যাচ্ছে, নাস্তার পর চায়ের কাপ হাতে সবাই গল্পগুজব করে নিচ্ছে বিশ-পঁচিশ মিনিটের জন্যে, তারপর লেগে যাবে যে-যার কাজে। কথা বলছে একজন, সবাই শুনছে। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে অদ্ভুত এক সম্প্রীতির ভাব বিরাজ করছে সবার মধ্যে, মুখে এক মনে আর নেই কারও।

দেখছি তো না, গিলছি যেন আমি ছবিগুলো। লোকগুলোর কোথাও কোন কৃত্রিমতা নেই। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এখানকার প্রত্যেকটা লোক যার যার পছন্দমত কাজ করে। কারও মধ্যে তাড়াহুড়ো বা কাজের চাপের কোন লক্ষণ নেই। মনের আনন্দে মনের মত কাজ করে সবাই যতক্ষণ খুশি, মধুর শ্রান্তি এলে বিশ্রাম নেয় তৃপ্তির সঙ্গে। মনের বিরুদ্ধে চলতে হয় না এখানে কাউকে।

এই ধরনের ছবি জীবনে দেখিনি আমি। লোকগুলো কিন্তু চেহারা-সুরতে সাদামাটা, সাধারণ—এই চেহারা অহরহই দেখি আমরা আশেপাশে। দুজনের বয়স বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে, দুজনের ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, আর তিনজন বেশ বয়স্ক—পঞ্চাশের উপর হবে বয়স। ছোট দুজনের মুখে দুশ্চিন্তার কোন ভাঁজ নেই। হঠাৎ কারণটা বুঝে ফেললাম আমি: ওরা ওখানেই জন্মেছে, ওটা এমন এক দেশ, যেখানে আশঙ্কা বা উদ্বেগের কোন স্থান নেই। ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে যে দুজন, তাদের কপালে আর গালে ভাঁজ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওগুলো গভীরতর হচ্ছে না আর, সেরে যাওয়া ক্ষতচিহ্নের মত যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। আর বয়স্ক তিনজনের মুখে রয়েছে স্থায়ী একটা শান্তির ছাপ। কারও চেহারায় রাগ, ঘৃণা, হিংসা বা বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই। বুঝলাম, সত্যিকার অর্থে সুখী ওখানে প্রত্যেকটা লোক। শুধু তাই নয়, বুঝলাম, দিনের পর দিন ধরে ওরা সুখী, শুধু অনেক···অনেকদিন ধরে সুখ ভোগ করছে তাই নয়, চিরকাল সুখী থাকবে, জানে ওরা।

ওদের কাছে যাবার ইচ্ছে হলো। তীব্র একটা বাসনা বোধ করলাম। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল, মনে হলো এক্ষুণি যদি ওদের সঙ্গে রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে আমি উপস্থিত থাকতে পারতাম! কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো লোকটার মুখের দিকে চেয়ে হাসির মত ভঙ্গি করলাম। বললাম, 'সত্যিই··· অপূর্ব!'

'হ্যাঁ।' হাসল লোকটা। 'এই ফোল্ডার দেখে সবাই এতই উৎসাহিত হয়ে ওঠে যে এছাড়া আর কোন কথা আলাপ করতে চায় না কিছুতেই। ওখানকার সব কথা জানতে চায়, খুঁটিনাটি সব কিছু: ওখানকার নিয়ম কানুন, কিভাবে কখন রওনা হওয়া যায়, কত ভাড়া—সব।'

'স্বাভাবিক,' বললাম। 'আমারও সেই অবস্থাই হয়েছে। সব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই আছে আপনার কাছে?'

'অবশ্যই। কী জানতে চান?'

'এই লোকদের সম্পর্কে···' ফোল্ডারের দিকে ইঙ্গিত করলাম। 'এদের জীবনধারা··· কী করে এরা?'

'কাজ করে। সবাই ওখানে কাজ করে।' পকেট থেকে ফাইভ ফিফটি

ফাইভের প্যাকেট বের করে সামনে বাড়িয়ে ধরল লোকটা, আমি মাথা নাড়তে নিজে ধরাল একটা। 'মনের মত কাজ করে জীবন কাটায় ওখানে সবাই। কেউ পড়ে। চমৎকার লাইব্রেরি আছে। কেউ কৃষিকাজে আগ্রহী—চাষাবাদ করে। কেউ লেখে। কেউ হাতের কাজে দক্ষ—সুন্দর সব জিনিস তৈরি করে। বেশির ভাগ লোকই ছেলেমেয়ে মানুষ করবার কাজে বেশ অনেকটা সময় ব্যয় করে। মোট কথা, যে যা চায় তা-ই করবার সুযোগ রয়েছে আমাদের ওখানে।'

'কেউ যদি কিছুই করতে না চায়?' বলাম। 'ধরুন, কোনকিছুই যদি তার ভাল না লাগে?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'সেটা হতেই পারে না। সব মানুষেরই কিছু না কিছু করতে ইচ্ছে হয়। কাজের ইচ্ছে আসলে মানুষের অন্তরের তাগিদেই আসে। মনের মত কাজ··· সে তো খেলারই নামান্তর, কাজকে কাজই মনে হবে না আপনার। যার যা ইচ্ছে সেটা করবার সুযোগ না থাকলেই প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় মানুষের মনে, আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়, কিছুই ভাল লাগে না, মনে হয় করবার নেই কিছুই। তাছাড়া এখানে নিজেকে জানা, কিংবা ঠিক কোন কাজে অন্তরের তাগিদ রয়েছে বোঝা, ইত্যাদির সময় কোথায়? সবকিছুতেই তাড়াহুড়ো লেগে আছে যেন।' কয়েক সেকেণ্ড আপন মনে সিগারেট টানল লোকটা। 'কিন্তু ওখানে জীবনটা শান্ত, সহজ। ক্ষমতার লড়াই, যুদ্ধবিগ্রহ, খুনোখুনি, স্বার্থপরতা একেবারেই অনুপস্থিত। যার যার মনের মত কাজের মাধ্যমে সে যদি পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়, সম্মান পায়, তা হলে তো আর একে অপরের পেছনে লাগবার প্রয়োজনই থাকে না। কাজেই ছোট-বড় নেই আমাদের ওখানে, সম্মানের কমবেশি নেই। সবাই সবাইকে ভালবাসছে, বাস করছে সমাজবদ্ধভাবে। যার যা ক্ষমতা, প্রয়োগ করছে সবাই সমাজের সমষ্টিগত মঙ্গলের উদ্দেশ্যে। ইলেকট্রিসিটি রয়েছে ওখানে। কাজের চাপ কমাবার জন্যে রয়েছে ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকিয়ুম ক্লিনার, মাইক্রোওয়েভ আভন। ওষুধপত্র রয়েছে, রয়েছে আধুনিকতম চিকিৎসার ব্যবস্থা। কিন্তু রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন বা গাড়িঘোড়া পাবেন না আপনি ওখানে। রোজ সকালে পিলে চমকে দেয়ার জন্যে খবরের কাগজ নেই। ওসবের প্রয়োজন পড়ে না ওখানকার বাসিন্দাদের। বড়জোর দুই বর্গমাইল নিয়ে এক একটা জনপদ। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তারা নিজেরাই তৈরি করে নেয়। প্রত্যেকে নিজের পছন্দ মত বাড়ি তৈরি করে নেয়, প্রতিবেশীরা সবরকমের সাহায্য করে তাকে। আমোদ-ফুর্তির হরেক রকম ব্যবস্থা রয়েছে ওখানে, যার যেমন খুশি তেমনি ভাবে অবসর বিনোদন করে; কিন্তু টিকেটের ব্যবস্থা নেই কোথাও—প্রমোদ বিক্রি করে না কেউ। সিনেমা, নাচ, গান, পার্টি, জন্মদিন, বিয়ে, সব রকমের খেলাধুলা, হাসি-তামাশা, হৈ-হুল্লোড়—কোনকিছুর কমতি নেই। একজন বেড়াতে যাচ্ছে আরেকজনের বাড়িতে, খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, গল্পগুজব হচ্ছে। বিশ্রামের সময়টা কেটে যাচ্ছে আনন্দে। প্রতিটা দিন পরিপূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠছে প্রত্যেকের। কারও ওপর কোন চাপ নেই—না সামাজিক, না অর্থনৈতিক। জীবন ওখানে সহজ, স্বচ্ছন্দ। নারী-পুরুষ-শিশু কারও মধ্যে দুঃখ বলতে কিছু খুঁজে পাবেন না আপনি।' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে মিষ্টি করে

হাসল লোকটা। 'মজা করার জন্যে তৈরি করেছি আমরা এই ফোল্ডার। বুঝতেই পারছেন, আমি যা বলছি, নিছক রসিকতার খাতিরেই বলছি।'

'তা তো বটেই,' আমিও হাসলাম। আমি জানি, সাবধানতার খাতিরে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় ওরা যে, এটা তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার মাথা ঝাঁকালাম। 'তা তো বটেই।'

আরেকটা পাতা উল্টালাম। নানান ধরনের ঘরের ছবি গোটা দশেক। নিচে লেখা: শান্তিকুটির। দূর থেকে যে বাড়িগুলো দেখা গিয়েছিল এগুলো নিশ্চয়ই সেগুলোর অভ্যন্তরীণ ছবি। জীবনযাত্রা বোঝাবার জন্যে ঘরের ভিতর থেকে তোলা হয়েছে ছবিগুলো—কোনটা শোবার ঘরের, কোনটা বৈঠকখানার, কোনটা রান্নাঘরের, কোনটা পড়ার ঘরের। আসবাবগুলো দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সময় বাঁচাবার জন্যে যেমন তেমন ভাবে খাড়া করা হয়নি ওগুলো; ধীরেসুস্থে, রীতিমত যত্নের সঙ্গে সুন্দর সব কারুকাজ খোদাই করা হয়েছে কাঠের গায়ে। প্রত্যেকটি জিনিস পরিপাটি, সুন্দর করে সাজানো। বেডকাভার, টেবিলক্লথ, পর্দা, প্রত্যেকটা জিনিসেই সুন্দর সব ডিজাইন, বাড়ির মেয়েদের নিজ হাতে করা। একটা ড্রইংরুমের দেয়ালে টাঙানো অয়েল পেইটিং খুব পরিচিত ঠেকল আমার চোখে··· অনেকটা আমাদের শিল্পী ইমরুল হাসানের ছবির মত। সোফাসেটের কারুকাজ দেখে রীতিমত চমকে উঠলাম আমি। একনাগাড়ে কাজ করলে যে-কোন ভাল কারিগরের অন্তত তিনটে বছর লাগবে ওগুলো তৈরি করতে।

'এত সময় পায় কি করে ওখানকার লোকেরা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'সময়ের অভাব নেই আমাদের ওখানে,' বলল লোকটা মুচকি হেসে। 'ওখানে মানুষ বাঁচে পাঁচ-ছয়শো বছর। আর একটা আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছি—তখন বাঁচবে দু'হাজার বছর।'

'আপনি কে?' সরাসরি চাইলাম লোকটার চোখের দিকে।

'পিছনের পাতায় লেখা আছে,' বলল লোকটা সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে চেয়ে। 'আমরা—মানে, ভার্নার আদি অধিবাসীরা প্রায় সবদিক থেকে পৃথিবীর মানুষের মতই। ভার্নায় আপনাদের পৃথিবীর মতই আকাশ, বাতাস, মাটি, পাহাড়, সমুদ্র, নদী—সব রয়েছে। আমাদের সূর্যটা অবশ্য আকারে বড়···আপনাদেরটার প্রায় দ্বিগুণ। চাঁদ আমাদের দুটো। কিন্তু আবহাওয়া প্রায় অবিকল এক। কাজেই এখানে যেমন হয়েছে, আমাদের ওখানেও জন্ম হয়েছে প্রাণের। আমরা যদিও আপনাদের চেয়ে কয়েক হাজার বছর আগেই সভ্য হয়েছি, আমরাও আপনাদের মতই মানুষ। শারীরিক গঠনে সামান্য পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু সেটা উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়। আপনাদের রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, সেক্সপীয়র, বার্নার্ডশ, টলস্টয়, দস্তোয়েভস্কি, হেমিংওয়েকে আমরা আপনাদের চেয়ে কম ভালবাসি না। আপনাদের চকোলেট আমাদের খুব পছন্দ—ওটার চল আগে ছিল না আমাদের মধ্যে। আপনাদের সঙ্গীতেরও আমরা মস্ত ভক্ত। বেটোফেন, মোজার্ট থেকে শুরু করে আপনাদের ওস্তাদ আলাউদ্দিন, আলী আকবর, রবিশংকর, ফৈয়ায খান, বড়ে গোলাম আলী—সবার রেকর্ডে ঠাসা রয়েছে আমাদের মিউজিক লাইব্রেরি। শুনলে অবাক হবেন, সম্রাট আকবরের দরবার থেকে মিঞা তানসেনের গোটা দশেক

খেয়াল রেকর্ড করে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের এক প্রতিনিধি। সব আছে আমাদের ওখানে। আপনাদের অনেক কিছু যেমন আমরা পছন্দ করি, তেমনি আমাদের অনেক কিছুও পছন্দ হবে আপনাদের। যদিও চিন্তা ভাবনার দিক থেকে, মনোবোধ আর জীবনের মূল লক্ষ্য ও সার্থকতার ধ্যান-ধারণার দিক থেকে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক থেকে আমাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে, তবু অসংখ্য ব্যাপারে মিল পাবেন আপনি দুই গ্রহের মধ্যে।' গোটা দুয়েক টান দিয়ে ফেলে দিল লোকটা সিগারেট। 'মজার তামাশা, তাই না?'

'হ্যাঁ। ভার্নাটা আসলে কোথায়?'

'আপনাদের হিসেব অনুযায়ী কয়েকশো আলোক বৎসর দূরে।'

'আলোক বৎসর মানে?'

'ওটা দূরত্বের একটা হিসেব। আলোর গতি হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। তার মানে প্রতি মিনিটে আলোকরশ্মি এক কোটি এগারো লক্ষ ষাট হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। প্রতি ঘণ্টায় যায় এর ষাটগুণ। প্রতি দিনে যায় তারও চব্বিশগুণ। বুঝতে পারছেন? এইভাবে যদি এক বৎসর ধরে আলোটা চলতে থাকে তা হলে যত মাইল যাবে সেই দূরত্বকে হিসেবের সুবিধের জন্যে বলা হয় আলোক বৎসর। আমাদের ভার্না পৃথিবী থেকে কয়েকশো আলোক বৎসর দূরে।

কেন জানি না, হঠাৎ মেজাজটা খিচড়ে গেল আমার। আচমকা আশাভঙ্গ হলে যেমন হয়, তেমনি।

'দূরত্বটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' বললাম আমি। 'আলোর সমান গতিতে চললেও কয়েকশো বছর লেগে যাবে ওখানে পৌঁছতেই। আলোর চেয়েও দ্রুত তো আর কিছু হতে পারে না?'

'কে বললে?' মৃদু হেসে চোখ টিপল লোকটা। এদিকে আসুন, বুঝিয়ে দিচ্ছি। একটু সরে আসুন এপাশটায়।' নির্দেশিত জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেই জানালার দিকে হাত বাড়িয়ে পিঠোপিঠি দাঁড়ানো বিশাল একজোড়া অফিস-বিল্ডিং দেখাল লোকটা। 'ওই যে জোড়া দালান দেখছেন, ওর একটার মুখ দিলকুশার দিকে, আরেকটার মুখ মতিঝিলের রাস্তার দিকে। দেখতে পাচ্ছেন দালান দুটো?'

আমি মাথা ঝাঁকাতেই আবার শুরু করল, 'মনে করুন দুই দালানের সাততালার ওপর কাজ করে দুই বান্ধবী, দুজনই স্টেনো-টাইপিস্ট। এদের দুজনেরই অফিস মনে করুন, দুই দালানের একেবারে শেষ দেয়াল ঘেঁষে। অর্থাৎ একভাবে ভাবতে গেলে দু'জন কিন্তু দু'জনের তিন-চার ফুটের মধ্যেই রয়েছে। অথচ সেলিনার সঙ্গে দেখা করতে হলে নাজমার এগোতে হবে সিঁড়িঘরের দিকে, এলিভেটর পেলে ভাল, নইলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে হবে নিচে। তারপর দালান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করবে সে ওই মোড়ের দিকে। মোড় ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসবে সে উল্টোদিকের দালানটার সামনে, লবিতে ঢুকে অপেক্ষা করবে এলিভেটরের জন্যে, পেলে ভাল, নইলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে হবে তার সাততলার ওপর, করিডর ধরে এগিয়ে সেলিনার অফিসের সামনে গিয়ে টিপতে হবে কলিংবেল। সেলিনা এসে ওকে নিজের কামরায় নিয়ে যাওয়ার পর

কথা বলবার আগে পুরো একটা মিনিট দম নিতে হবে নাজমার। কিন্তু আসলে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করল নাজমা?—বড়জোর তিন কি চার ফুট।' হাসল লোকটা। 'আপনাকে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, নাজমা যেভাবে সেলিনার কাছে গেল সেটা মহাশূন্যযানের পথ চলার মত দীর্ঘ এক যাত্রা, আক্ষরিক অর্থে বাস্তব অতিক্রমণ। কিন্তু তা না করে যদি সে কোনভাবে তিন-চার ফুট দেয়াল অতিক্রম করতে পারত নিজের বা দেয়ালের কোন ক্ষতি না করে, তা হলে আর··· বুঝলেন না, এইভাবেই চলি আমরা··· মহাশূন্য পাড়ি না দিয়ে সেটাকে এড়িয়ে যাই।' কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'দূরত্ব যত শ' আলোক বৎসরই হোক না কেন, এখানে শ্বাস টানবেন, ছাড়বেন ভার্নায়।'

বুঝলাম, কল্পনাতীত কিছু আবিষ্কার করেছে ওরা, কিংবা বলা যায় না, হয়ত কল্পনাকেই আবিষ্কার করেছে, তারই সাহায্যে কোটি কোটি মাইল পেরিয়ে যেতে পারে ওরা চোখের পলকে। বললাম, 'সেইভাবেই এসেছে নিশ্চয়ই এটা? নিশ্চয়ই ওখানে তোলা হয়েছে ছবিগুলো?' ফোল্ডারের দিকে চোখের ইশারা করলাম।

'ছাপাও হয়েছে ওখানেই।'

'কেন?'

কয়েক সেকেণ্ড ঠিক যেন বুঝতে পারল না লোকটা আমার প্রশ্ন, তারপর বলল, 'আপনার প্রতিবেশীর ঘর আগুন লেগে পুড়ে যেতে দেখলে আপনার সাধ্যমত সাহায্য করবেন না আপনি তাকে? উদ্ধার করতে চেষ্টা করবেন না যতজনকে পারা যায়?'

'করব।'

'তেমনি আমরাও করছি।'

'এতই খারাপ!' অবাক হয়ে চাইলাম আমি লোকটার মুখের দিকে। 'আমাদের অবস্থা এতই খারাপ তা হলে?'

'আপনার কাছে কতটা খারাপ মনে হয়?'

খবরের কাগজের হেডলাইনগুলো ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। বললাম, 'খুব একটা সুবিধের নয়।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। বলল, 'আপনাদের সবাইকে ওখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, খুব বেশি লোক চাই না আমরা আমাদের গ্রহে। তাই বাছাই করে নিচ্ছি।'

'কতদিন ধরে কাজ চলছে?'

'বহুদিন।' হাসল লোকটা। 'আপনাকে বলেছি, সম্রাট আকবরের দরবারে আমাদের লোক ছিল। কিন্তু তখন আমরা কেবল দর্শকের ভূমিকায় ছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কী ঘটতে চলেছে আপনাদের ভাগ্যে। সাতচল্লিশ সালে যখন ভারতবর্ষকে ভেঙে দিয়ে ব্রিটিশরা চলে গেল এদেশ ছেড়ে, তখনই আমরা বুঝে নিয়েছি উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ—ওই বছরেই আমাদের এজেন্সি খুলি আমরা বম্বে, করাচী আর ঢাকাতে। সময় ঘনিয়ে আসছে দ্রুত, তাই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় বড় শহরেই খুলেছি আমরা কাউন্টার, প্রতি বছর হাজার দুয়েক লোক বাছাই করে পাঠানো হচ্ছে ভার্নায়।'

'সাতচল্লিশ সালে...' কি যেন মনে পড়ে যেতে চাইছে আমার। হঠাৎ স্মরণ হলো। 'আচ্ছা! ওই বছরই না...'

'ঠিক ধরেছেন,' আমার প্রশ্নটা আঁচ করে নিয়ে মুচকে হাসল লোকটা। 'ওই বছরেরই শেষের দিকে নিখোঁজ হয়েছিলেন আপনাদের খালেদ চৌধুরী, তেপ্পান্ন সালে শিল্পী ইমরুল হাসান। এই যে ছবিটা দেখছেন...' ফোল্ডারের সেই অয়েল পেইন্টিং দেখাল লোকটা তর্জনীর নখ দিয়ে, 'ওটা ওখানে বসে এঁকেছেন ইমরুল হাসান, এখনও অক্লান্তভাবে একের পর এক অপূর্ব ছবি এঁকে চলেছেন তিনি। খালেদ চৌধুরী অবশ্য মারা গেছেন গত বছর। এমনিতেই অনেক বয়স হয়েছিল তাঁর। আরও দশটা উপন্যাস লিখে গেছেন তিনি এই কয় বছরে, সব রয়েছে আমাদের লাইব্রেরিতে। এই যে বাড়িটা দেখছেন...' পাতা উল্টে বড় ছবিটার একজায়গায় আঙুল রাখল সে, 'এটাই খালেদ চৌধুরীর বাড়ি ছিল। এখন পাবলিক লাইব্রেরি।'

'আর জাস্টিস আবুল হাশেম?'

'আবুল হাশেম?'

'আর একটা সাড়া জাগানো নিখোঁজ সংবাদ। সিক্সটিফাইভে হঠাৎ নিখোঁজ হয়েছিলেন তিনি।'

'ঠিক বলতে পারছি না। শুনেছি ঢাকা থেকে এক জজ গেছেন বছর দশেক আগে, নামটা খেয়াল নেই।' নাক চুলকাল। 'তবে আপনাদের জাহিদ রায়হানের ব্যাপারটা জানা আছে আমার পরিষ্কার। আমার হাত দিয়েই...'

'জাহিদ রায়হান! উনিও কি আপনাদের ওখানে?' চোখজোড়া ছানাবড়া হয়ে গেল আমার। 'মারা যাননি তা হলে তিনি? যুদ্ধের পরপরই...'

'হ্যাঁ। বাহাত্তরের গোড়ার দিকে তাকে নিয়ে যাই আমরা। কাগজে অনেক হৈ-চৈ হয়েছে তাঁকে নিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত, শেষপর্যন্ত সবাই ধরে নিয়েছে মারাই গেছেন ভদ্রলোক। আসলে মারা যাননি তিনি, অপূর্ব তিনটে হাসির ফিল্ম তৈরি করেছেন ওখানে বসে। দারুণ হিট ছবি। ওফ্...হাসতে হাসতে খিল ধরে যায় পেটে। দেখেছি আমি তিনটেই।'

আগ্রহের আতিশয্যে কাউন্টারের উপর কনুই রেখে ঝুঁকে এলাম আমি সামনে। কম্পিত কণ্ঠে বললাম, 'আপনাদের রসিকতা আমার পছন্দ হয়েছে। কতটা, তা বুঝিয়ে বলবার ভাষা আমার নেই।' অনেকটা অনুনয়ের সুরে বললাম, 'কবে, কখন এ রসিকতা সত্যি হবে?'

পলকহীন চোখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল লোকটা আমার চোখের দিকে, তারপর নিচু গলায় বলল, 'এখনি। যদি আপনি চান।'

মাতাল লোকটার কথা পরিষ্কার মনে পড়ল আমার। ও বলেছিল: ওইখানে দাঁড়িয়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে হবে আপনার ঝটপট। একবার হেলায় হারালে কোনদিন সুযোগ পাবেন না আর। আমি জানি, এ আমার নিষ্ঠুর বাস্তব অভিজ্ঞতা।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম আমি কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। কিছু লোক আছে যাদের দেখতে না পেলে বেশ খারাপ লাগবে আমার; একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ের

কথা হয়েছিল··· বেশ পছন্দও হয়েছিল ওকে: ছোট ভাইটা পড়ছে—ওর লেখাপড়ার ব্যাপারে অনেকটা নির্ভর করত বাবা আমার পাঠানো একশো টাকার উপর—তাছাড়া এই পৃথিবীতেই জন্ম আমার। একটা আক্ষেপ আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু যেই ভাবলাম, যদি এখন পিছিয়ে যাই, এখান থেকে বেরিয়ে ছাতা মাথায় ফিরব মেসে, নিরানন্দ সন্ধে ডিঙিয়ে আসবে ক্লান্তির রাত, সকালে উঠে রওনা হব অফিসের দিকে, আরও ক্লান্ত হয়ে বিকেলে ফিরে আসব মেসে, এইভাবে চলতে থাকবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—অমনি চোখের সামনে পরিষ্কার ফুটে উঠল আশ্চর্য সুন্দর সেই উপত্যকার ছবি, সুখী মানুষদের ছবি, সেই উচ্ছল পাহাড়ি নদীটার ছবি। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।

'যদি আমাকে নেন, যাব আমি।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখটা পরীক্ষা করল লোকটা। তারপর স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'ভাল করে ভেবে দেখুন। মনস্থির করে উত্তর দিন। আমরা চাই না আমাদের ওখানে গিয়ে কেউ অসুখী হোক, বা অনুশোচনায় ভুগুক। আপনার মনে যদি সামান্যতম দ্বিধা বা অনিশ্চয়তা থাকে, তা হলে বরং···'

'কোন দ্বিধা নেই। আমি যাব,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

কাঁচাপাকা জুলফি চুলকাল লোকটা, তারপর একটা ড্রয়ার টেনে ট্রেনের টিকেটের মত ছোট্ট একটা হলুদ কার্ড বের করল। কার্ডের মাঝ বরাবর লম্বালম্বি ভাবে একটা সিকি ইঞ্চি চওড়া সবুজ দাগ, সেই দাগের উপরে-নিচে ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে কয়েকটা কথা: ঢাকা টু ভার্না। ওয়ান ওয়ে ওনলি। ভ্যালিড ওনলি ফর টুডে। নন-ট্র্যান্সফারেবল। অর্থাৎ, আজই রওনা হতে হচ্ছে আমার, ফিরে আসতে পারছি না আর কোনদিন, এই টিকেট আর কারও কাছে হস্তান্তরও করতে পারছি না।

'কত··· মানে, কত দিতে হবে? পকেটে হাত দিলাম। এরা টাকা নেয় কিনা জানি না বলে দোটানা ভাব নিয়ে বের করলাম মানিব্যাগটা।

ব্যাগটার দিকে চাইল লোকটা। 'যা আছে সব। ভাঙতি যা আছে তাও।' হাসল লোকটা। 'টাকার দরকার পড়বে না আর আপনার, কিন্তু আমরা আপনার এই টাকা দিয়ে এখানকার খরচ চালিয়ে নিতে পারব কিছুটা। অনেক খরচ আমাদের: লাইট বিল, ভাড়া, গাড়ির মেইন্টেন্যান্স···'

'কিন্তু আমার কাছে বেশি যে নেই!'

'তাতে কিছু এসে যায় না। কাউন্টারের নিচের আর একটা তাক থেকে একটা তারিখ বসাবার যন্ত্র বের করল লোকটা। টিকেটটা যন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে চাপ দিল মাথার উপর। 'একবার একটা টিকেট বিক্রি করে পেয়েছিলাম তেরোনব্বই হাজার টাকা। ঠিক ওই রকম আর একটা টিকেট বিক্রি করেছি আমরা পাঁচ পয়সায়।' টিকেটটা বাড়িয়ে ধরল সে এবার আমার দিকে। দেখলাম: ভ্যালিড ওনলি ফর টুডে লেখাটার নিচে তারিখ পড়ে গেছে।

মানিব্যাগে যা ছিল সব বের করে দিলাম, সব মিলে হলো একশো বত্রিশ টাকা, পকেট হাতড়ে খুচরো পাওয়া গেল সাতাশী পয়সা, সেগুলোও বের করে রাখলাম কাউন্টারের উপর। অবাক লাগল ভাবতে, আজ মাসের তিন তারিখ,

অথচ বাকি টাকা সব শেষ!

'এই টিকেট নিয়ে সোজা চলে যান আমাদের কমলাপুর ডিপো অফিসে,' বলল লোকটা। 'হেঁটে যাবেন। পথে কারও সাথে ভুলেও আলাপ করবেন না ভার্না সম্পর্কে। বুঝতে পেরেছেন?'

আমি মাথা ঝাঁকাতেই কোন রাস্তা ধরে কোনদিকে কতদূর গেলে পাওয়া যাবে ওদের ডিপো অফিস তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে বিদায় করে দিল সে আমাকে মিষ্টি হাসি হেসে। ছাতাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কমলাপুরের পুল পেরিয়ে আরও বেশ অনেকটা গিয়ে বাজারের কাছাকাছি পাওয়া গেল অফিসটা। ছোট একখানা পুরানো রঙচটা সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে: ড্রিম ডিপো। জরাজীর্ণ অবস্থা ঘরটার। মেঝেটা পাকা, দেয়াল আর ছাত জং ধরা টিনের, সামনে ছোট্ট এক চিলতে বারান্দা।

অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি, কাদা হয়ে গেছে সরু রাস্তায়। গোটা কয়েক বিছানো ইঁটের উপর সাবধানে পা ফেলে উঠে এলাম বারান্দায়। আধ-ভেজানো দরজা ঠেলে উঁকি দিলাম ভিতরে। গ্রামের পোস্ট অফিসের মত জীর্ণ একটা কাউণ্টার, ওপাশে দাঁড়িয়ে কাগজপত্র ঘাঁটছে একজন লোক গভীর মনোযোগের সঙ্গে, দাঁতের ফাঁকে চুরুট। এপাশে গোটা কয়েক বেঢপ ডিজাইনের খটখটে চেয়ার। জনা পাঁচেক লোক বসে আছে চেয়ারে। আমি মাথা গলাতেই পাঁচজোড়া চোখ ফিরল আমার দিকে। নিরুৎসুক দৃষ্টি। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো লোকটা বহুকষ্টে কাগজপত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করল তার দৃষ্টি, আমার উপর মোটামুটি ভাবে নজর বুলিয়েই দৃষ্টি স্থির হলো এসে আমার হাতে। টিকেট দেখাতে হবে বুঝতে পেরে চট করে বের করলাম ওটা বুক পকেট থেকে। মাথা ঝাঁকাল লোকটা গম্ভীর ভাবে, অবশিষ্ট খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল বসবার জন্যে, তারপর আবার ডুবে গেল নিজের কাজে। লোকটার চাঁদির ঠিক একহাত উপরে একটা তারের মাথায় জ্বলছে একখানা উলঙ্গ বালব।

বসলাম। আমার পাশের চেয়ারে বসে আছে এক তেইশ চব্বিশ বছরের যুবতী, হাত দুটো আঁকড়ে ধরে আছে সাদা একখানা ভ্যানিটি ব্যাগ। এ কেন ভার্নায় চলেছে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলাম। দেখে মনে হচ্ছে বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের রিসেপশনিস্ট। বসের সঙ্গে গোপন প্রেম ধরা পড়ায় কি ভাগছে এখন বস-গিন্নীর ভয়ে? নাকি ঝগড়া হয়েছে প্রেমিকের সঙ্গে? যাই হোক, মেয়েটা দেখতে ভাল। কে জানে, হয়ত ভার্নায় গিয়ে দেখা যাবে এরই সঙ্গে বাঁধা পড়েছে আমার ভাগ্য। মনে মনে বুঝলাম, হলে নেহাত মন্দ হবে না ব্যাপারটা। মেয়েটার পাশের দুটো চেয়ারে দুজন প্রৌঢ় নারী-পুরুষ, দুজনই দেখতে স্কুল মাস্টারের মত—সাদামাটা পোশাক, গাম্ভীর্য, সবকিছুতেই সেই ছাপ। এদের পাশে বসে আছে একজন ইউরোপীয়ান, কি করে বা করত আন্দাজ করতে পারলাম না। তার পাশে বসা একজন প্রবীণ লোক, ষাটের কাছাকাছি হবে বয়স। আমাদের দিক থেকে মুখটা একটু ফিরিয়ে আধ-ভেজানো দরজা দিয়ে বৃষ্টির দিকে চেয়ে রয়েছে ভদ্রলোক। অত্যন্ত দামি পোশাক-পরিচ্ছদ, বাম হাতের অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে সোনার আঙটিতে বাঁধানো একখানা দামি পাথর। দেখে মনে হচ্ছে, বিরাট কোন

ব্যাংক বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। টিকেটের জন্যে এই লোক কত টাকা দিয়েছে না জানি!—ভাবলাম।

বৃষ্টি-বাদল দুর্যোগের দিন, সন্ধে ঘনিয়ে এল একটু আগেভাগেই। প্রায় পৌনে একঘণ্টা অপেক্ষার পর কেমন একটু অধৈর্য লেগে উঠল। শুধু জুতো না, প্যান্টও হাঁটু পর্যন্ত চুপচুপে ভেজা, শীত শীত লাগছে। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো লোকটা কাজ করছে তো করছেই, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। কিছু জিজ্ঞেস করব কিনা ভাবছিলাম, এমনি সময়ে একটা ইঞ্জিনের ঝরঝরে আওয়াজ কানে এল। দরজা দিয়ে চেয়ে দেখি ব্রিটিশ আমলের এক পুরানো লক্কড়ে বাস এসে থেমে দাঁড়াল সামনের রাস্তায়। ধোঁয়া বেরোচ্ছে ইঞ্জিন থেকে, সারাটা শরীর এত জোরে কাঁপছে যে, মনে হচ্ছে এক্ষুণি কব্জা খসে খুলে পড়ে যাবে দরজা। পুরানো পেইন্টের উপর দরজা জানালা রাঙাবার সবুজ এনামেল পেইন্ট দিয়ে রঙ করা হয়েছিল বাসটা খুব সম্ভব বছর পাঁচেক আগে, এখানে ওখানে চল্টা উঠে গিয়ে চেহারা হয়েছে এখন ঘেয়ো কুকুরের মত। টায়ারের গ্রেডগুলো কবে ঘষে ক্ষয়ে সমান হয়ে গিয়েছে কেউ বলতে পারবে না। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এদিকে চেয়ে বার দুই 'পঁক্-পঁক্' ভেঁপু-হর্ন বাজাল ড্রাইভার। চোখ তুলল চুকটখেকো ব্যক্তবাগীশ, আমাদের ইঙ্গিত করল বাসে গিয়ে উঠবার জন্য।

এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে, চারপাশে পানি ছিটাতে ছিটাতে কমলাপুর স্টেশনের সামনে ভাল রাস্তায় উঠল হেঁড়ে বাসটা। তারপর ঘণ্টায় বারো মাইল বেগে গদাইলস্করী চালে রওনা দিল সোজা পশ্চিম দিকে। দুপাশের জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে বলে আমরা ছয়জন বসে আছি বাসের মাঝ বরাবর লম্বালম্বি ভাবে পাতা একটা বেঞ্চের উপর, চড়চড় শব্দে বৃষ্টি পড়ছে গাড়ির ছাতে, বিষণ্ন ভঙ্গিতে চেয়ে রয়েছি আমরা বাইরের দিকে। এ-মোড়ে, ও-মোড়ে ভিড় দেখলাম; কয়েকটা বাসস্ট্যাণ্ডে ছাতা মাথায় অপেক্ষা করছে যাত্রীরা বাসের জন্য—কিন্তু বেঁকাই-বাস থামছে না, বিস্ফোভ দেখলাম যাত্রীদের চোখে-মুখে; একটা প্রাইভেট কার ছলাৎ করে একরাশ কাদাপানি ছিটিয়ে একজনের পরিষ্কার কাপড় নষ্ট করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল—রাগ দেখলাম লোকটার মুখে; বাংলা মোটরের কাছে লাল ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে থেমে দাঁড়াল আমাদের বাস, পিলপিল করে রাস্তা পেরোচ্ছে অনেক ধরনের অনেক মানুষ—অসংখ্য মানুষের মুখ দেখলাম আমি, কিন্তু কারও মুখে হাসি বা খুশির চিহ্নমাত্র দেখলাম না। কী এক মস্ত ভার যেন রয়েছে সবার কাঁধে, বইতে পারছে না, তবু বইতে হচ্ছে বিষণ্ন মনে।

ঝিমুনি এসে গেল আমার গাড়ির ঝাঁকুনিতে। চলছে তো চলছেই, পথের যেন শেষ নেই। একবার চোখ মেলে দেখলাম মিরপুর ব্রিজ পেরোচ্ছি। বেশ গাঢ় হয়ে গেছে সন্ধ্যা, বাঁধা গতিতে চলছে বাস সাভারের দিকে, বামপাশে সমুদ্রের মত বিশাল বিল, জোর বাতাসে ফেনা উঠে গেছে ঢেউয়ের মাথায়। আবার চোখ বুজে এল, ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেল চোখের পলকে—যখন চোখ খুললাম, চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চলার বিরাম নেই, এখনও চলছে বাসটা ঝাড়খেড়ে বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলে। তিন ওয়াটের ছোট্ট একটা বাতি জ্বেলে দিয়েছে ড্রাইভার এপাশে,

সেই আলোয় দেখলাম যেমন ছিল তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সবাই যে যার জায়গায়।

নয়ারহাট, ধামরাই ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ বাম দিকে মোড় নিয়ে একটা খোয়া বিছানো রাস্তায় পড়ল বাস। সেই রাস্তা ধরে আধমাইল গিয়ে থেমে দাঁড়াল আবার মোড় নিয়ে। হেডলাইটের ম্লান আলোয় খামারবাড়ি দেখতে পেলাম সামনে। ইঞ্জিন থামিয়ে হেডলাইট অফ করে দিল ড্রাইভার, খামারের কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। ড্রাইভারকে দরজা খুলে নামতে দেখে আমরাও নেমে পড়লাম সার বেঁধে।

বৃষ্টি কমে গেছে। ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা একটা গোলাঘরের দিকে। বেড়ার ঝাঁপ তুলে আমাদের ভিতরে ঢুকবার ইঙ্গিত করল ড্রাইভার, সার বেঁধে ঢুকলাম, ঝাঁপ নামিয়ে নিজেও ভিতরে চলে এল সে। টর্চ জ্বালল। দেখলাম বড়সড় ঘরটার একপাশে গাদা করা রয়েছে খড়, আসবাব বলতে ঘরের মাঝখানে লম্বালম্বিভাবে পাতা একটা কাঠের বেঞ্চ। মেঝেটা মাটির। কেমন সোদা একটা গন্ধ, অনেকটা গোয়ালঘরের মত।

বেঞ্চের উপর আলো ফেলল লোকটা। বলল, 'বসে পড়ুন। প্লীজ সিট ডাউন।' বসলাম সবাই। বলল, 'টিকেট, প্লীজ।' বের করলাম যার যার টিকেট। একটা পাঞ্চিং মেশিন দিয়ে কুট-কুট কেটে দিল লোকটা সবার টিকেট। টর্চের আলোয় দেখলাম, মেঝের উপর গোল গোল অনেক চাকতি পড়ে আছে। বোঝা গেল, বহু লোকের টিকেট পাঞ্চ করা হয়েছে এখানে এর আগে। দরজার কাছে চলে গেল লোকটা, একহাতে ঝাঁপটা তুলে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল পিছন দিকে। 'চলি, গুড লাক। চুপচাপ বসে থাকুন ওখানটায়।' পিছনে আকাশ থাকায় আবছা মত দেখলাম আমরা লোকটাকে। হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, ঝপ করে নেমে গেল ঝাঁপ। বেড়ার ফাঁকে বিন্দু বিন্দু টর্চের আলো দেখা গেল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর সব অন্ধকার। খানিক বাদেই শোনা গেল ইঞ্জিনের গর্জন, ঝরঝর আওয়াজ তুলে চলে গেল বাসটা।

চুপচাপ বসে আছি। আমাদের ছয়জনের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া কোথাও কোন আওয়াজ নেই। নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে সময়। বাসের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরেও কেটে গেছে পাঁচমিনিট। অস্বস্তি বোধ করছি। কারও সঙ্গে কথা বলবার অদম্য ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু মন্তব্য খুঁজে পেলাম না। কেমন যেন বিব্রত বোধ করছি, বোকা বোকা লাগছে নিজেকে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, নির্জন এক খামারের পরিত্যক্ত গোলাঘরে বসে আছি আমরা বোকার মত, কেউ যদি এসে জিজ্ঞেস করে এখানে বসে কী করছি আমরা ক'জন, উত্তর নেই; কোন জবাব দিতে পারব না আমরা। বেশ শীত লাগছে। অস্থিরভাবে পা নাচালাম কিছুক্ষণ। কেটে গেল আরও দশ মিনিট। তারপর হঠাৎ বুঝে ফেললাম সব।

দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে সবকিছু। মুহূর্তে ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় গরম হয়ে উঠল আমার মুখটা। রাগে অন্ধ হয়ে গেলাম। ঠকানো হয়েছে আমাদের! বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নির্মমভাবে ঠকানো হয়েছে আমাদের সবাইকে। কোন সন্দেহ নেই তাতে। টাকা পয়সা যা ছিল সর্বস্ব নিয়ে এখানে ছেড়ে দিয়ে

গেছে। আসলে ঠকবাজের দল ওরা—হায় হায় কোম্পানি। থাকো এখন বসে! যতক্ষণ না হুঁশ হচ্ছে বসে থাকো, তারপর যখন আজগুবি গল্পের মোহ কাটবে যেমন ভাবে পার ফিরে যাও ঢাকায়। এদের বিরুদ্ধে নালিশ করেও কোন লাভ নেই। এদের উদ্ভট সব কথায় বিশ্বাস করায় লোকে গালি দেবে আমাদেরই। ছিঃ ছিঃ! কী করে বিশ্বাস করলাম আমি ওসব? কী করে আটকা পড়লাম ওদের কথার জালে? একলাফে উঠে দাঁড়ালাম, অসমান মেঝের উপর দিয়ে দরজার দিকে এগোলাম অন্ধকার হাতড়ে। এক্ষুণি থানায় খবর দেয়া, বা ওই জাতীয় কিছু একটা করার ইচ্ছে ছিল আমার মনে। ঝাঁপটা বেশ ভারি ঠেকল, জোরে ধাক্কা দিয়ে তুলে ফেললাম। বাইরে বেরিয়ে ঝাঁপটা নামিয়ে দিতে গিয়েও পিছন ফিরলাম আর সবাইকে ডাকব বলে।

মরতে মরতে বেঁচে গেছে এমন যে-কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন, কিংবা আপনার হয়ত নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে, সেকেণ্ডের দশভাগের একভাগ সময়ে মানুষ কতকিছু দেখতে, বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারে; আর সেসব কত স্পষ্টভাবে আঁকা হয়ে যায় মনের পর্দায়। যেই পিছন ফিরলাম, ওমনি দপ করে তীব্র একটা আলো জ্বলে উঠল গোলাঘরের ভিতর। হাত থেকে খসে ঝপাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল ঝাঁপটা। কিন্তু সেইটুকু সময়ের মধ্যেই রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশের মত তীব্র এক ঝলক নীল আলো দেখতে পেলাম, হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিলাম ওদের ডাকবার জন্যে—জীবনে এত মিষ্টি বাতাস আমি বুকের ভিতর টানিনি। পরিষ্কার দেখতে পেলাম সেই উপত্যকা, ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া সবুজ জঙ্গল, সেই পাহাড়ি নদী, তার তীরের ঘরগুলো। পাগলের মত ঝাঁপটা খুলবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, বেড়ার গায়ে খামচিই দিলাম কেবল, খুলতে পারলাম না। ততক্ষণে নিভে গেছে আলোটা—বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আছি আমি গোলাঘরের বাইরে।

বড় জোর তিন সেকেণ্ড লাগল আমার ঝাঁপটা খুলে আবার ভিতরে ঢুকতে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। শূন্য গোলাঘর। অন্ধকার। পকেট থেকে ম্যাচ বের করে জ্বাললাম। কেউ নেই বেঞ্চের উপর—খালি। মাটিতে পড়ে আছে অনেকগুলো গোল চাকতির মত হলুদ টিকেটের কাটা অংশ। নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে ঘরের সবাই, কেউ নেই। আমি জানি, উপত্যকা বেয়ে নেমে যাচ্ছে ওরা এখন স্বপ্ননীড়ের দিকে, বিচিত্র এক জগতে পদার্পণের বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে আছে ওদের অন্তর, চোখে আশার আলো। আনন্দে শিরশির করছে ওদের বুকের ভিতরটা। হাসছে ওরা—সুখী!

আমি, আবদুল খালেক, এখনও কাজ করি এজিবি অফিসে··· টাইপিস্ট। ভাল লাগে না আমার এই কাজ, তবু রোজ যেতে হয়, ফিরি বিকেলে, ক্লান্তপায়ে হেঁটে ফিরে আসি মেসে, নিরানন্দ সন্ধে ডিঙিয়ে ক্লান্তিকর রাত আসে, তারপর বিষণ্ন সকাল, খবরের কাগজ পড়ি, হতাশার খবর, আবার অফিসে যাই। মাসের প্রথম দিকে এক-আধটা বই কিনি, সারামাস সেটাই উল্টাই-পাল্টাই, সময় কাটতে চায় না, সত্যিই, কিছুই ভাল লাগে না আমার। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই খাবার খেয়ে চলেছি, একই থালায়, একই পিঁড়িতে বসে,

স্বাদ বদলের সঙ্গতি নেই, জানি, কোনদিন সঙ্গতি হবেও না। মাঝে মাঝে টিনের বাক্সটা খুলি, ভাঁজ করা কাপড়ের তলা থেকে বের করি একটা হলুদ টিকেট, ওতে লেখা আছেঃ ভ্যালিড ওনলি ফর টুডে, নিচে তারিখ—সে তারিখ পার হয়ে গিয়েছে কবে!

গিয়েছিলাম। পরদিনই। ড্রিম ট্র্যাভেল এজেন্সিতে। সেই সুদর্শন লম্বা লোকটা আমাকে দেখেই কাউন্টারের ওপাশে একটা ড্রয়ার টেনে বের করে দিল একশো বত্রিশ টাকা সাতাশী পয়সা। গম্ভীর। 'কাল এগুলো ফেলে গিয়েছিলেন কাউন্টারের ওপর,' আমার চোখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলল, 'কেন, তা আপনিই জানেন।'

এমনি সময়ে কয়েকজন খরিদ্দার এসে ঢুকল, ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা। তাদের নিয়ে, ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর রইল না আমার। এরপরেও গিয়েছি—একবার নয়, দু'বার নয়, বহুবার। ফিরে এসেছি।

আমি আমার সুযোগ হারিয়েছি, কিন্তু আপনাদের সুবিধের জন্যে বলছিঃ দেখে মনে হবে ওটা আর দশটা ট্র্যাভেল এজেন্সির মতই সাধারণ একটা অফিস। যে-কোন বড় শহরে খুঁজলেই পেয়ে যাবেন—হয়ত অন্য নামে, অন্য পরিচয়ে। সাদামাটা দু'চারটে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করবেন, তারপর সেই ফোল্ডারটার ব্যাপারে সামান্য একটু আভাস দেবেন। কিন্তু খবরদার! যা-ই করুন না কেন, সরাসরি ওটার কথা বলবেন না। ওকে সময় দিতে হবে আপনাকে একটু ওজন করে বুঝে নেয়ার। যদি আপনাকে পছন্দ হয়, ও নিজেই কথা তুলবে। যদি তোলে, দয়া করে বিশ্বাস রাখবেন, দয়া করে মতিভ্রম ঘটতে দেবেন না নিজের। কারণ, একবার হেলায় হারালে জীবনে আর কোনদিন সুযোগ পাবেন না আপনি। আমি জানি। বিশ্বাস করুন।

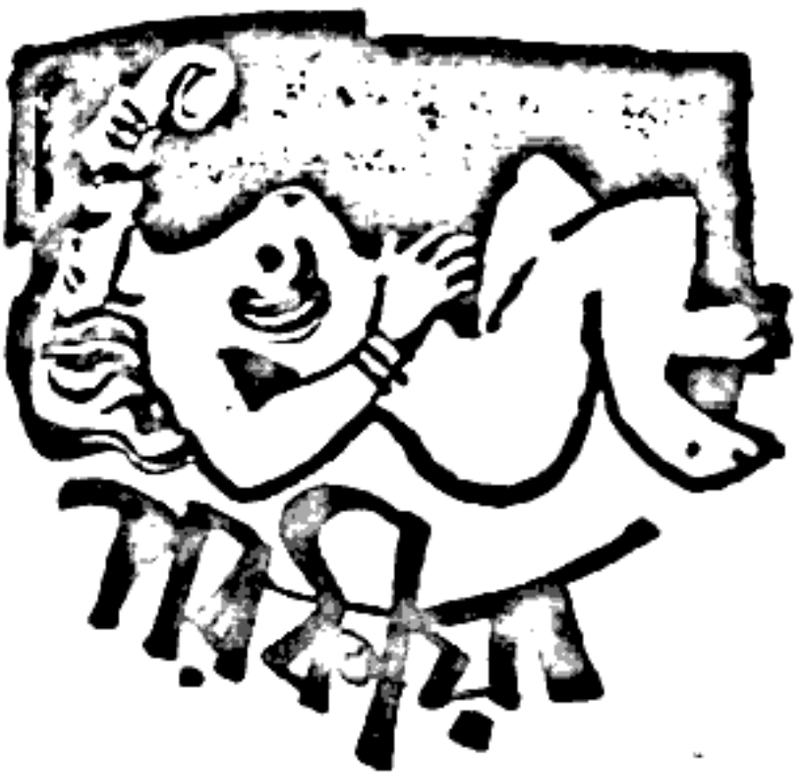

পরকীয়া

শীতের রাত। রাত তিনটে। চট্টগ্রাম।

টেলিফোন।

পঞ্চম রিঙে চোখ মেলল নায়ক। আস্তে লেপ সরিয়ে নেমে পড়ল খাট থেকে। অন্ধকার হাতড়ে বেডরুম থেকে বেরিয়ে ডাইনিং রুমের এলোমেলো চেয়ার এড়িয়ে ড্রইংরুমে পৌছতে-পৌছতে রাগ হলো ওর—থামে না, তীক্ষ্ণ সুরে বেজেই চলেছে! ও আসছে বলে যে সুরটা একটু নিচু করবে, তা না। যতই কাছে আসছে ততই উৎকট, কর্কশ লাগছে ফোনের ক্রিং ক্রিং ধাতব আওয়াজ। রিসিভারটা কানে তুলল সে।

'ট্রাঙ্কল···ঢাকা থেকে,' অপারেটরের ঘুমঘুম কণ্ঠ। 'মিস্টার সাজ্জাদ কবিরের কল।'

'বলছি,' ভারি গলায় বলল নায়ক। খুক করে একটু কেশে নিয়ে আরও সুন্দর করল ডেলিভারি। 'লাইন দিন, সাজ্জাদ বলছি।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, খুটখাট যান্ত্রিক শব্দ, তারপর ভেসে এল একটা নারীকণ্ঠ। চাপা, উত্তেজিত।

'সাজ্জাদ? নায়লা!'

'কী ব্যাপার? এত রাতে?' ঘুমের রেশ কেটে গেছে নায়কের। শীত শীত লাগছে। স্লিপিং গাউনটা আর একটু জড়িয়ে নিল। অন্ধকার সত্ত্বেও আসবাবপত্র আবছা আকৃতি নিতে শুরু করেছে। রিসিভারের পাশেই ফোমের সোফাটা দেখতে পেল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছি নিশ্চয়ই? কিন্তু উপায় ছিল না! সত্যি। রাগ কোরো না, লক্ষ্মী। এদিকে ভয়ানক অবস্থা। পাগল হবার দশা হয়েছে আমার।'

'আমার জন্যে?' সোফাটা হাত বাড়িয়ে একবার ছুঁয়ে নিয়ে বসে পড়ল নায়ক।

'না। মানে, হ্যাঁ।··· কী যা তা বলছি! মাথার ঠিক নেই আমার! সাজ্জাদ, মামুন এসে হাজির হয়েছে। ঘরে ঢুকেই মারতে লেগেছে···আমি···'

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল নায়কের।

'টেক ইট ইজি, নায়লা। কী হয়েছে খুলে বলো দেখি? মাঝখান থেকে না, গোড়া থেকে।'

'এক ঘণ্টা আগে। ঘুমাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস তুমি ছিলে না পাশে! তুমি ভেবে

দরজা খুলেছিলাম, খুলেই দেখি মামুন। মদ খেয়ে একেবারে টরর হয়ে আছে। জোর করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। প্রথমে যা-তা গালাগালি...' ফুঁপিয়ে উঠল নায়লা। 'তারপর বেদম মার। আমি...'

'ঠিকানা পেল কোথায়? কী করে জানল কোথায় আছ তুমি?'

'কি জানি! কেউ নিশ্চয়ই দিয়েছে ওকে এই ফ্ল্যাটের ঠিকানা। শোনো, ও বলছে কিছুতেই ডিভোর্স দেবে না। মরে গেলেও না। কঠিন সব কসম খাচ্ছে, কান্নাকাটি করছে। কিছুতেই ছাড়বে না।' কাঁপা শ্বাস টানল নায়লা। 'কী হবে এখন? কোন দিশা পাচ্ছি না যে! কী করি...কোথায় যাই...কোন পথ দেখছি না কোনও দিকে। পাগল হয়ে যাব আমি, সাজ্জাদ...'

'শান্ত হও,' বলল নায়ক। দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথার ভিতর।

'তুমি ঢাকায় থাকলে কিচ্ছু ভাবতাম না,' আবার কথা বলে উঠল নায়লা। 'সোজা গিয়ে উঠতাম...যে যাই মনে করুক, সোজা গিয়ে উঠতাম তোমার বাসায়। তুমি আসছ কবে? অনেকদিন তো হলো, আর কতদিন, সাজ্জাদ?'

মানসচক্ষে পরিষ্কার দেখতে পেল নায়ক মেয়েটিকে। দীর্ঘ দুই বছরের প্রেম...ওর প্রতিটা অঙ্গভঙ্গি, এক্সপ্রেশন মুখস্থ হয়ে গেছে নায়কের। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে মেয়েটার উদভ্রান্ত চেহারা, এলোমেলো চুল, বিস্রস্ত বেশবাস, গালের ভাঁজে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার রেখা।

'আর অল্পদিন, নায়লা। বড়জোর একমাস। শূটিংটা শেষ হলেই উড়ে চলে আসব তোমার কাছে।'

'আরও এ-ক মা-স! অতদিন তোমাকে ছাড়া বাঁচব কী করে?'

'কাজ শেষ না করে কীভাবে আসি বলো?'

'তুমি না বলেছিলে একমাস লাগবে? চোদ্দদিন তো হয়েই গেছে, আরও একমাস লাগবে কেন?'

'আউটডোরের ব্যাপার...বঙ্গোপসাগরে ডিপ্রেশন, ব্যস, আকাশ মেঘলা, শূটিং বন্ধ—গেল সাতদিন। প্রোডাকশন তো চায় যত তাড়াতাড়ি পারে শেষ করতে, কিন্তু ঘাপলার কি আর শেষ আছে? এই তো সেদিন এক ডিনারে আবোল-তাবোল খেয়ে পেট খারাপ হয়ে গেল নায়িকার, ঝাড়া তিনদিন তিনরাত চলল পাতলা পায়খানা—হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হলো পুরো ইউনিটকে। যাই হোক, আগামী একমাসের মধ্যে আউটডোর শেষ করতে না পারলে এফ. ডি.সি.-র শিডিউল মিস হয়ে যাবে; কাজেই একমাসের মধ্যে যেমন করে হোক ফিরতেই হবে আমাদের।'

'কিন্তু একটা মাস তো অনেক সময়! আমি চলে আসি? আপত্তি কোরো না, প্লীজ! তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমার যে কী অবস্থা...'

'অসম্ভব!' বলল নায়ক। 'এই মুহূর্তে কোন স্ক্যানডাল হলে আমার ক্যারিয়ার শেষ। তুমি তো জানো, এই ছবিতে হিট করতে না পারলে এতবড় সুযোগ আমি আর পাব না জীবনে। তুমিই তো তুলে এনেছ আমাকে আজকের এই অবস্থানে, এতদিনে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছি আমি, কাগজে লেখালেখি হচ্ছে আমাকে নিয়ে, পরিচালকদের নজরে পড়তে শুরু করেছি—নিজ হাতে সব পণ্ড করতে পার না তুমি এখন। তোমার সাহায্য ছাড়া...'

'জানি। ওসব বলে আর ছোট কোরো না আমাকে, সাজ্জাদ। কতটুকু দিতে পেরেছি আমি তোমাকে? টাকা-গহনাই কি সব? আমার সবকিছু যদি তোমার ক্যারিয়ারের কাজে লেগে থাকে, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। দরকার হলে তোমার জন্যে প্রাণও দিতে পারি আমি। ঠিক আছে, আসব না; তুমি বলছ যখন, দূরেই সরে থাকব আরও একটা মাস।'

'দ্যাট'স আ গুড গার্ল।' কয়েক সেকেণ্ড 'পজ' দিল নায়ক। 'ও কোথায় এখন?'

'কে? ও···ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা! মাতলামির ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে কার্পেটের ওপর। নাক ডাকছে, শুনতে পাচ্ছ না? পাশের ঘরে। জেগে উঠলে যে কী করব, কী হবে, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।'

হাত বাড়িয়ে রিসিভারের পাশে ফেলে যাওয়া পাঁচশো পঞ্চান্নর প্যাকেটটা তুলে নিল নায়ক, একহাতে ঢাকনি খুলে বের করল একটা সিগারেট, ধরাল। হুইস্কির মাত্রা বেশি পড়ে যাওয়ায় মুখটা বিস্বাদ লাগছে এখন। টেলিফোন অপারেটর জানতে চাইল কথা শেষ হয়েছে কিনা, বিশ মিনিট এক্সটেণ্ড করতে বলল সে। নায়লার কাঁপা শ্বাস শুনতে পেল। মনস্থির করে নিয়ে ডাকল, 'নায়লা!'

'কী করি এখন বলে দাও আমাকে, সাজ্জাদ! ঘুম থেকে উঠেই···'

'কীসে করে এসেছে মামুন?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল নায়ক। 'রিকশা, স্কুটার, না গাড়ি?'

'গাড়িতে। আমাদের সেই পুরানো ফোর্ডটায় করে। ওইতো, দেখতে পাচ্ছি, রাস্তায় পার্ক করা আছে গাড়িটা।'

'ওকে আসতে দেখেছে কেউ?' গলাটা স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করল নায়ক।

'রাত দুটোর সময় একেবারে নিঝুম হয়ে যায় এই এলাকা। ঘুমিয়েই ছিলাম। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে দশটা পর্যন্ত টেলিভিশন দেখে ঘুমিয়ে পড়ি রোজ। সারাদিন বাসায় থাকি। কোথাও যাই না, কিছু ভাল্লাগে না। রাত দুটোয় দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ শুনে আমি ভাবলাম···ওহ-হো, কী যেন জিজ্ঞেস করেছিলে তুমি? ও হ্যাঁ···না, আমার মনে হয় কেউ দেখেনি ওকে এখানে আসতে। মার খেয়েও জোরে কাঁদেনি, পাছে লোক জমে যায়।'

প্রায় এক মিনিট চুপ করে থাকল নায়ক। ক্ষীণ একটা নাক ডাকার আওয়াজ আসছে কানে। বিস্বাদ মুখে ভাল লাগছে না সিগারেট, তবু টেনে চলল। চোখ দুটো ছোট হয়ে এসেছে একাগ্র চিন্তার ফলে।

'সাজ্জাদ?'

'আছি লাইনে।'

'কী করব বললে না? কালশিটে দাগ পড়ে গেছে আমার সারা গায়ে, কপাল কেটে গেছে এক জায়গায়। যদি আরও গোলমাল করে? যদি সত্যিই ডিভোর্স না দেয়?'

'সেটাই তো সমস্যা।'

'এমন নির্বিকার ভাবে কথা বলছ কেন, সাজ্জাদ? তোমার খারাপ লাগছে না?'

'লাগছে। ভাবছি।'

সত্যিই ভাবছে নায়ক। যতদূর পর্যন্ত ভাবা যায় ভেবে নিচ্ছে সে। নিজের ক্ষমতায় অবাক হয়ে গেল সে নিজেই। ঘুম থেকে উঠলে দারুণ কাজ করে ওর মাথা। কঠিন সমস্যা পানির মত সহজ হয়ে যায়। দারুণ সব প্ল্যান এসে যায় ছবির মত স্পষ্ট।

'আমাকে সত্যিই ভালবাসো, নায়লা?' আশ্চর্য কোমল নায়কের কণ্ঠস্বর।

'তাতে কোন সন্দেহ আছে তোমার? তুমি জান না, তোমার জন্যে করতে পারি না এমন কোনও কাজ নেই?'

'জানি। তবু আর একটু শিওর হয়ে নিলাম। শোনো।' নিজের অজান্তেই খানিকটা সামনে ঝুঁকে এল নায়ক। 'আমি বুঝতে পারছি, ভয়ানক গোলমাল করবে তোমার স্বামী। সহজে ছাড়বার পাত্র ও নয়। অথচ তুমি বলেছিলে ওকে কাটিয়ে দেয়া কিছুই না। সেই কথার ওপর ভরসা করেই এগিয়েছিলাম আমি। মনে আছে? এখন তো দেখছি আমার মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। উঠতি নায়কের নামের সাথে যদি কেলেঙ্কারি জড়িয়ে যায়, তা হলে তার ভবিষ্যৎ কী, কল্পনা করতে পার? গ্ল্যামারাস স্ক্যাণ্ডাল অন্য কথা, কিন্তু এই ধরনের সস্তা দরের নোংরা কেলেঙ্কারি...'

'কী বলতে চাইছ, সাজ্জাদ?' ভয় পেয়েছে মেয়েটা।

'আমি বলছি, লুকোচুরি খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করা, পালিয়ে পালিয়ে প্রেম করা, একসাথে বিছানায় গিয়েও স্বস্তি নেই...কখন কী হয়; বিরক্ত হয়ে উঠেছি আমি একেবারে। আশা করেছিলাম আর কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে সব, অথচ দেখছি দিন দিন বেড়েই চলেছে।'

'কোথায় বাড়ল? বাড়েনি তো!' অনুনয় ফুটে উঠল নায়লার কণ্ঠে। 'তোমাকে কোনও বিপদে ফেলেছি আমি, বলো?'

'এতদিন ফেলোনি, এবার ফেলবে বলে মনে হচ্ছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি, বিপদ আসছে, ও থাকতে আমাদের সুখ-শান্তি হবে না।'

'সাজ্জাদ!' কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল আবার নায়লার গলা। 'তোমার কথা শুনে ভয় লাগছে আমার। এভাবে কথা বলছ কেন? কী করব বুঝতে পারছি না...তুমি বলে দাও কী করব। যা বলবে তা-ই করব আমি।'

কয়েক সেকেণ্ড বিরতি। লম্বা করে এক চুমুক ধোঁয়া টেনে ছাতের দিকে ছাড়ল নায়ক। মনে মনে আশা করল, ওদের কথোপকথন শুনছে না টেলিফোন অপারেটার, যদি শোনেও, এই ঝুঁকিটা না নিয়ে কোন উপায় নেই। শুনে ফেললে প্ল্যানটা ভেস্তে যাবে বড়জোর; আর কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই—ভেবে দেখেছে সে। গলার স্বর নাটকীয় ভাবে নামিয়ে আনল খাদে।

'ওকে শেষ করে দিতে হবে। ও থাকলে তোমার আমার মিলন হবে না কোনদিন।'

'কী বলছ, সাজ্জাদ! বুঝতে পারছি না আমি।'

'ঠিকই বুঝতে পারছ, নায়লা,' বলল নায়ক। 'পানির মত পরিষ্কার বুঝতে পারছ। হয় এদিক, নয় ওদিক, হয় আমি, নয় ও।'

নায়লার আঁৎকে ওঠা টের পেল নায়ক। বুঝতে পারল, ফেঁসে গেছে। আপত্তি

হবে, প্রতিবাদ করবে, কিন্তু বড়শিটা খসাতে পারবে না ও কিছুতেই।

'এসব কী বলছ তুমি, সাজ্জাদ! তোমার মাথাটা···'

'হয় ও, নয় আমি,' চাপা গলায় বলল নায়ক। 'আজ রাতেই ফয়সালা হতে হবে। আমি ভেড সিরিয়াস।'

'কিন্তু কীভাবে? কী চাইছ তুমি? আমাকে···আমি কী করব?' বেসুরো নায়লার গলা, শেষের দিকে বুজে এল।

'অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে না ও কার্পেটের ওপর? তুমি বলেছিলে ড্রিঙ্ক করলে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা এরকম পড়ে থাকে ও একনাগাড়ে। কাজেই কাজটা সহজ। কেউ দেখেনি ওকে তোমার ঘরে ঢুকতে। রাস্তাঘাট নির্জন। কাকপক্ষীও টের পাবে না।'

'কিন্তু কীভাবে?' চাপা উত্তেজনায় তীক্ষ্ণ নায়লার কণ্ঠ।

'বড় বালিশটা রয়েছে না তোমার বিছানায়? ওই যেটা কয়েক মাস আগে কিনেছিলাম আমি পায়ে দেয়ার জন্যে?'

'না! সাজ্জাদ! পারব না। আমি পারব না!' নায়কের বক্তব্য টের পেয়ে গেছে সে। কাঁপছে গলা।

যেন নায়লার কথা শুনতেই পায়নি, এমনি ভাবে বলল নায়ক, 'বালিশটা তুলে নাও, নায়লা। রোগা-পটকা মানুষ, সজ্ঞান অবস্থাতেও তোমাকে ঠেকাবার সাধ্য ছিল না ওর, অজ্ঞান অবস্থায় তো বাধা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নাক-মুখের ওপর ঠেসে ধর বালিশ। পাঁচ মিনিট···যথেষ্ট।'

'সাজ্জাদ, দোহাই লাগে তোমার···'

'ঠিক আছে,' অভিমান ফুটে উঠল নায়কের কণ্ঠে। 'তোমার সিদ্ধান্ত তোমার। তবে আমার ওই এক কথা: হয় ও, নয় আমি। বেছে নাও তোমার যাকে খুশি।'

ওপার থেকে কান্নার আওয়াজ এল আবার। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয় আর অনিশ্চয়তার চাপা কান্না। পৌনে দুইশো মাইল দূরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে ওর প্রেয়সী হতভাগিনী। ধৈর্য ধরল নায়ক। একটা গাড়ি চলে গেল পাশের রাস্তা দিয়ে। হেডলাইটের আলোর প্রতিফলন দেখা গেল স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে আবছা, শব্দটা মিলিয়ে গেল দূরে। চারদিক নিস্তব্ধ। সিগারেটের মাথায় লালচে আগুনের দিকে চেয়ে প্রতীক্ষা করছে সে।

'সাজ্জাদ, তুমি নিশ্চয়ই সত্যি করে···'

'সত্যি করেই বলছি, নায়লা। কথায় কথায় হাজার বার বলেছ তুমি, ও মরলে হাড় জুড়োয় তোমার। এই সুযোগ যাচ্ছে। তোমার-আমার দুজনেরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর ওপর।'

'কিন্তু···কিন্তু একটা মানুষ···আমার স্বামী। আপনভোলা একটা লোক··· খারাপ, অস্বীকার করছি না···'

'কতটা খারাপ তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না,' ছবির একটা ডায়ালোগ বলল নায়ক। 'তোমার-আমার জীবনে ও এক অভিশাপ। অশুভ কালো ছায়া।' ভাবাবেগ সামলে নেয়ার ভঙ্গিতে পনেরো সেকেণ্ড চুপ করে থেকে ঘনিয়ে তুলল নাটক। গলার স্বর পরিবর্তন করে বলল, 'এর বেশি আমার আর কিছুই বলার

নেই, নায়লা।'

'সাজ্জাদ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নায়লা। 'ফোন ছেড়ে দিয়ো না, প্লীজ। আর···এভাবে কথা বোলো না। মনে হচ্ছে অনেক দূরে সরে গেছ তুমি। ভয় করছে। তুমি জান না, তোমাকে, তোমাকে হারালে আমি আত্মহত্যা করব···সত্যি!'

'তা হলে যা বলেছি করছ তুমি?'

'হ্যাঁ, করব···যা বলবে তাই। কিন্তু···কিন্তু ভয় লাগছে, সাজ্জাদ। ইশ্, তুমি যদি এখন পাশে থাকতে। এখানে আমি একা। কার বুকে মুখ লুকিয়ে সান্ত্বনা খুঁজব? কবে পাব তোমাকে?'

'আর অল্পদিন। আর মাত্র একটা মাস।'

'কিন্তু ভয়ে কাঁপছি যে! বাচ্চা মেয়ের মত কাঁপছি। মাথাটা ব্যথা করছে। বেশ অনেকটা কেটেছে। তোমাকে দেখাতে পারলে দূর হয়ে যেত সব ব্যথা। আমি···'

'বালিশটা তুলে নাও, নায়লা। ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে তোল ওটা। ওর হাত থেকে চিরতরে নিস্তার পাব আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই।'

'নিয়েছি!' কেঁপে গেল নায়লার গলা। 'বড় ভয় করছে, সাজ্জাদ!'

'মনে করো আমি তোমার পাশেই আছি। কোন ভয় নেই।'

'হ্যাঁ। কোন ভয় নেই। কিন্তু কাঁপুনি থামছে না, সাজ্জাদ। বলো, চিরদিন পাশে থাকবে?'

'চিরদিন। এবার এগিয়ে যাও। তোমার অপেক্ষায় ফোন ধরে থাকব আমি।'

'সাজ্জাদ—'

'আর কোন কথা নয়। মনে রেখো, আমি তোমার পাশে আছি। কাজটা শেষ করে ফেলো। এরপর কী করতে হবে ভেবে বের করে ফেলি আমি ইতিমধ্যে।'

'আমাকে ঘৃণা করবে না কোনদিন?'

'কেন ঘৃণা করব? যা করছ, আমার ইচ্ছেতেই করছ তুমি। তোমার-আমার দু'জনের মঙ্গলের জন্যে! একমাস পর আবার মিলন হবে আমাদের। নির্ভয়, নিষ্কণ্টক।'

'মনের মধ্যে জোর পাচ্ছি না···খোদা! মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাব এক্ষুণি।'

'পারবে না? ঠিক আছে, না পারলে থাক।' কণ্ঠস্বরটা একটু কঠোর করল নায়ক।

'না, না। পারব। পারব আমি। ধরে থাকো, ছাড়লাম।'

টিপয়ের উপর রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ এল। তারপর সব চুপ। আরেকটা সিগারেট ধরাল নায়ক, প্রথম টানেই আধ ইঞ্চি ছোট করে ফেলল সিগারেটটা। কানের সঙ্গে চেপে ধরে আছে রিসিভার। নাক ডাকার ক্ষীণ আওয়াজটা তো নেই! হাতটা কাঁপছে কিনা দেখার জন্যে চোখের সামনে তুলল সে। আঁধারে হাত দেখা গেল না, কিন্তু সিগারেটের মাথায় ম্লান, লালচে আলোটা একজায়গায় স্থির থাকছে না কিছুতেই। কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পেল সে নায়লার তিন কামরার ফ্ল্যাট বাড়িটা। শোবার ঘরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে—খাট,

আলনা, টেলিফোন, ড্রেসিং টেবিল, সাদা রঙের ছোট্ট ট্রানজিস্টার রেডিও, ঘরের কোণে বিশ ইঞ্চি সোনি টেলিভিশন—সব। কিন্তু পাশের ঘর, অর্থাৎ ড্রইংরুমের কিছুই মনে করতে পারছে না। শুধু দেখতে পাচ্ছে রঙচঙে কার্পেটের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটা লাশ। চট্ করে মনটাকে ফিরিয়ে আনল সে চট্টগ্রামে। লক্ষ করল, ঘাম নামছে ওর জুলফি বেয়ে। সিগারেট টানছে, আর অপেক্ষা করছে নায়ক, অপেক্ষা করছে, আর সিগারেট টানছে। একবার মনে হলো যেন ধস্তাধস্তির আওয়াজ এল কানে, আবার মনে হলো কারও ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল।

সমস্ত মনোযোগ একত্রীভূত হয়েছে ওর কানে। কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না ওদিক থেকে। কতক্ষণ কেটে গেছে হিসেব নেই। কুলকুল করে বুক বেয়ে, ডান হাতের কনুই বেয়ে ঘাম নেমে আসছে ফোঁটায় ফোঁটায়। ধুপধাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা অসমান তালে। বহু, বহুক্ষণ পর, যেন একযুগ পর নায়লার ক্ষীণ, কম্পিত স্বর কানে এল।

'সাজ্জাদ?'

'আছি লাইনে।'

'হয়ে গেছে, সাজ্জাদ। শেষ। মরে গেছে। মেরে ফেলেছি ওকে। খানিক ছটফট করেই স্থির হয়ে গেল। সাজ্জাদ, কার্পেটের ওপর পড়ে আছে লাশটা, অসহায় ভঙ্গিতে···নিথর, নিস্পন্দ।'

'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ। ছোট আয়নাটা ধরেছিলাম ওর নাক-মুখের সামনে···সিনেমায় যেমন করে। নিঃশ্বাস নেই। পালস দেখেছি। নেই। মরে গেছে!' বড় কর্কশ শোনাল কথাগুলো। যেন জজ সাহেবের রায়। ছটফট করে উঠল নায়লা। 'কিছু একটা বলো, সাজ্জাদ। অমন চুপ করে রয়েছ কেন? এখানে চারটা দিক একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কিছু বলো, প্লীজ!'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। মনটা শক্ত করো।'

'চিৎ হয়ে পড়ে আছে লাশ!'

'শোনো, নায়লা, প্রথম অর্ধেক হয়ে গেছে, এবারে বাকি অর্ধেক সেরে ফেলতে হবে ঝটপট।'

'তুমি আসছ কবে, সাজ্জাদ?'

'যে কোনদিন। একমাস লাগবেই তার কোন মানে নেই। কাজ শেষ করতে পারলে আগেই চলে আসব।'

'আর কোনদিন আমাকে ছেড়ে দূরে যাবে না?'

'বলেছি তো, কোনদিন না।' একটু অসহিষ্ণু নায়কের কণ্ঠস্বর। 'আর কথা নয়, লক্ষ্মী, এবার বাকি কাজগুলো সেরে ফেলো।'

'কী করতে হবে এখন?'

'তোমার বিছানা থেকে একটা কম্বল নিয়ে ওটা দিয়ে মুড়ে ফেল লাশটা।'

'তারপর?'

'সামনের রাস্তায় কেউ আছে কিনা দেখে নাও ভাল করে। গাড়িটা একেবারে দোরগোড়ায় নিয়ে এসো। তারপর যত তাড়াতাড়ি পার তুলে ফেলো ওটা পেছনের

সিটে।'

'আ-আমি পারব না, সাজ্জাদ।'

'পারতেই হবে। আর কোন উপায় নেই। তোমাকেই পারতে হবে। অসুবিধে হওয়ার তো কথা না···আশি পাউণ্ড হবে না ওর ওজন। পারবে। টেনে হিঁচড়ে গাড়ির কাছে নিতে পারলেই তো হলো।'

'কলজে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ভয়ে। বিশ্বাস কর, ওকে মারতে গিয়ে অর্ধেক মরে গেছি আমি।'

'কিন্তু কাজটা তো আর অর্ধেক করে ফেলে রাখা যায় না। আর কারও সাহায্য নেয়াও যায় না। তোমাকেই করতে হবে। মনটা শক্ত করে নাও, নায়লা। যেটা করতেই হবে সেটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলাই ভাল। তোমার ওপরেই নির্ভর করছে এখন সব। নইলে আমিও ডুবব, তুমিও।'

'আমাকে সত্যিই ভালবাসো তুমি, সাজ্জাদ?'

'নিশ্চয়ই। তা নইলে এসব করতে বলছি কেন? আমাদের দু'জনের সুখের জন্যেই তো।'

'কতটা ভালবাসো, সাজ্জাদ?'

'অনেক! এখান থেকে যতটা দূরে আছ, ততটা। নাও, এবার শুরু করো।'

'হ্যাঁ, করছি। শুধু বলো, সব ঠিক-ঠিক হবে তো? কোন গোলমাল···'

'কিচ্ছু না। পানির মত সহজ।'

'কাজ শেষ করেই ফিরে আসছ তুমি আমার কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর বিয়ে হচ্ছে আমাদের?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমাকে ঠিক এতটাই ভালবাসবে তুমি চিরদিন। বাসবে না? কোনদিন ছেড়ে যাবে না আমাকে?'

'কোনদিন না।'

'মস্তবড় অভিনেতা হবে তুমি। সকালে আমাকে চুমো খেয়ে চলে যাবে কাজে। তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি। প্রত্যেকদিন কাজ শেষ করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তুমি, তোমার জন্য খাবার সাজিয়ে বসে থাকব আমি। জামা-জুতো খুলে দেব। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ছোট্ট সংসার। আমাদের দু'জনের মিষ্টি, মধুর, নিবিড় প্রেম দেখে সবাই হিংসে করবে আমাকে। সবাই ভাববে···'

'নায়লা।'

'শুধু মুখে একবার বলো, লক্ষ্মী। ঠিক এমনি হবে না আমাদের জীবনটা? আমাদের প্রেম···'

'হ্যাঁ। ঠিক এমনি হবে। যেমন কল্পনা করছ, ঠিক তেমনি।'

'এবার আর কোন ভয় নেই আমার, সাজ্জাদ। এখন তোমার জন্যে আমি সব করতে পারব।'

'লাশটা গাড়িতে তুলতে পারবে?'

'পারব। যা বলবে, সব পারব।'

'তা হলে শোন, গাড়িতে তুলেই রওনা হয়ে যাবে মিরপুরের দিকে। মিরপুর ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় সাইড করে থামাবে গাড়িটা। আশপাশটা দেখে নিয়ে নদীতে ফেলে দেবে লাশ। দাঁড়াবে না, ফেলেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে আসবে, ইন্টারকনের সামনে ওটা ছেড়ে দিয়ে হেঁটে ফিরে আসবে, বাসায়। গ্লাভ্‌স্ পরে নিয়ো হাতে···সেই সবুজ গ্লাভ্‌স্ জোড়া আছে না?'

'আছে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

'নায়লা, শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।' নায়লার কণ্ঠ ক্ষীণ, দুর্বল।

'আর দেরি করা যায় না। এক্ষুণি রওনা হওয়া দরকার। লক্ষ্মী মেয়ে···'

'তোমার জন্যেই কাজটা করেছি আমি, সাজ্জাদ। তোমাকে সুখী করার জন্যেই। আর কারও জন্যে···'

'জানি,' আদর ঝরছে নায়কের কণ্ঠে। 'আমি জানি সেটা, নায়লা।'

'প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি আমি তোমাকে, সাজ্জাদ।'

'আমিও। কিন্তু আর দেরি কোরো না, লক্ষ্মী, খানিক বাদেই ফরসা হতে শুরু করবে চারদিক।'

'ফিরে এসে আমি কল্ বুক করব, না তুমি?'

'আমিই করব। আর এক ঘণ্টা পর। ততক্ষণে ফিরে আসবে তুমি নিরাপদে কাজ সেরে।'

'তুমি কাছে থাকলে ভাল হতো।'

'সত্যিই ভাল হতো। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় যখন···'

'জানো, প্রতিটা মুহূর্ত তোমার কথা ভাবি আমি।'

'আমিও।'

'সত্যি করে বলো তো, যে কাজটা করলাম, এর জন্যে কোনদিন ঘৃণা করবে আমাকে?'

'আরও বেশি করে ভালবাসব।'

'আবার বলো কথাটা, প্লীজ!'

'আরও বেশি করে ভালবাসব।' এক-দুই-তিন; মনে মনে গুনল নায়ক, তারপর বলল, 'চিরদিন!'

'আরেকবার, প্লীজ!'

'আরও বেশি করে ভালবাসব। কিন্তু দেখো···'

'যাচ্ছি। আর কোনও ভয় নেই আমার। এখন সব পারব আমি। সাজ্জাদ?'

'কি?'

'ফোন করছ তো ঠিক?'

'করছি। একঘণ্টার মধ্যেই।'

'বাইরেটা একটু যেন ফরসা ঠেকছে।'

'তা হলে জলদি করো।'

'হ্যাঁ···যাই। সাজ্জাদ?'

'বলো।'

'না, কিছু না। ও খোদা, ভয় লাগছে!'

'মনটা শক্ত করো, নায়লা। টেক ইট ইজি।'

'ঠিক আছে। ছাড়ছি। ফোন কোরো কিন্তু।'

'আচ্ছা, ছাড়লাম।'

বলল ঠিকই, কিন্তু ওপাশ থেকে ক্লিক করে কানেকশন কাটার আওয়াজ না পাওয়া পর্যন্ত রিসিভারটা কানে ধরে রাখল নায়ক। লাইনটা ডেড হয়ে যেতেই নামিয়ে রাখল রিসিভার। ঘরটা এখনও অন্ধকার, ঠাণ্ডা। বেশ শীত পড়েছে আজ। শেষ সিগারেটটা বের করে ধরাল নায়ক, খালি প্যাকেটটা মুঠোয় চেপে দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল অন্ধকার ঘরের কোণে। চোখ বুজে সিগারেট টানল এক মিনিট, তারপর ক্রেডল থেকে রিসিভারটা তুলে নিল আবার। ডায়াল করল চট্টগ্রাম পুলিস হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে। একবার রিঙ হতেই খটাং করে আওয়াজ হলো, তারপর ভেসে এল একটা কর্কশ পুরুষ কণ্ঠস্বর।

'আগ্রাবাদ থানার ও. সি. বলছি।'

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল নায়ক। নির্ভুল হতে হবে অভিনয়টা।

'আমার নাম সাজ্জাদ কবির। আমি একজন অভিনেতা। সিনেমার। আউটডোর শুটিঙে এসেছি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, উঠেছি এখানে আমার এক বন্ধুর বাংলোয়, সার্সন রোডে। মিনিট দশেক আগে ঢাকা থেকে আমার এক বন্ধুর স্ত্রী ফোন করেছিলেন। ভয়ানক উত্তেজিত মনে হলো তাঁকে, বিকারগ্রস্তের মত, কথাবার্তায় কোন পারম্পর্য নেই। কাজেই বুঝতে পারছি না ওঁর কথা ঠিক বিশ্বাস করা যায় কিনা, কিন্তু উনি বলছিলেন এই কিছুক্ষণ আগে নাকি উনি ওঁর স্বামী, অর্থাৎ আমার সেই বন্ধুটিকে খুন করেছেন। মারধোর সহ্য করতে না পেরে নাকি এই কাজ করে বসেছেন উনি। লাশটা মিরপুর ব্রিজ থেকে নদীতে ফেলে দিতে যাচ্ছেন উনি এখন। ব্যাপারটা পাগলের প্রলাপ হওয়া বিচিত্র নয়, আবার সত্যি হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়। শুনেছি, গোলমাল ছিল ওঁদের। আমার মনে হয় ঢাকা-পুলিসকে এই মুহূর্তে ব্যাপারটা জানানো দরকার।'

দারুণ এফিশিয়েন্ট অফিসার-ইন-চার্জ। অল্প কথায় জেনে নিল কি গাড়ি, কোন্ এলাকা থেকে কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবে, কোথায় ফিরে আসবে, লাইসেন্স প্লেটের নাম্বার বলতে না পারায় বলল তাতে দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই, নায়লার ফ্ল্যাটের নাম্বার টুকে নিল, তারপর নায়কের কর্তব্যবোধ এবং সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে সবশেষে বলল ঢাকা-পুলিসের কাছ থেকে কোনও মেসেজ এলে সঙ্গে সঙ্গেই জানাবে নায়ককে, ফোন নাম্বারটা লিখে নিয়ে কেটে দিল কানেকশন।

আরও একটা মিনিট চোখ বুজে বসে রইল নায়ক। মনে মনে হিসেব কষে দেখল কোথাও কোন ভুল হয়েছে কিনা। যা যা বলছে তার উপর ভিত্তি করে যে-সব প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রত্যেকটার সঙ্গতিপূর্ণ যথাযথ সদুত্তর রয়েছে তো? কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল হিসেব। নিখুঁত। কেউ জড়াতে পারবে না ওকে। কোথাও কোন

ভুল নেই। শুধু মনটা একটু খচখচ করছে নায়লার জড়োয়া সেটটার কথা ভেবে। যাকগে, মানুষের সব আশা কি পূর্ণ হয়? যাক, ওটা পুলিসের পেটেই যাক।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিগারেটটা টিপে নিভিয়ে দিল সে অ্যাশট্রেতে। উঠে দাঁড়াল। সান্ত্বনা দিল নিজেকে—মনে খেদ রাখতে নেই, অনেক পেয়েছে সে নায়লার কাছে, একসেট জড়োয়া সে তুলনায় কিছুই নয়। মায়ের দেয়া জড়োয়াটা কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারেনি বেচারী, সেজন্যে ওকে দোষ দেয়া যায় না। কেই বা পারে?

সাবধানে, অন্ধকারে কোথাও ঠোকর না খেয়ে ফিরে এল নায়ক বেডরুমে। আস্তে করে লেপ সরিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। এখনও গরম হয়ে আছে লেপটা। চিৎ হয়ে শুয়ে ছাতের দিকে চেয়ে রইল নায়ক। ঘুম আর আসবে না আজ।

পাশ ফিরল নায়িকা। একটা হাত রাখল নায়কের বুকে। নরম গলায় শুধাল, 'কার ফোন?'

'ওই···এক বন্ধুর,' বলল নায়ক। 'কখন জেগে গেলে আবার?'

'তুমি উঠে যেতেই। অনেক দেরি দেখে ভাবছিলাম কোন মেয়ে বুঝি।' ঘুমঘুম আলস্য নায়িকার কণ্ঠে, আলতো স্পর্শে মসৃণ আমন্ত্রণ। নগ্ন উরু তুলে দিল নায়কের পায়ের উপর। কানের কাছে অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বলল, 'কে মেয়েটা?'

পাশ ফিরল নায়ক। মিষ্টি একটা সেন্টের সুবাস এল নাকে। হাতটা লেপের তলায় খুঁজল নরম কিছু। পেয়ে হাসল। আরেকটু কাছে টেনে নিল নায়িকাকে।

'দূর! মেয়ে আসবে কোত্থেকে? ব্যবসায়ী বন্ধু। বিজনেস ডিল হলো একটা।'

'অনেক টাকার?'

'নাহ্। ছোট্ট ডিল। হাজার পঞ্চাশেক থাকবে বড় জোর।'

'পঞ্চাশ হাজার তোমার কাছে···উহু, ওখানে না, প্লীজ···সুড়সুড়ি লাগে। অ্যাই···' খিলখিল হেসে চিমটি কাটল নায়িকা নায়কের বুকে। আর একটু ঘনিষ্ঠ হলো। নরম নিচু গলায় বলল, 'ভাল লাগছে! আ···হ্!'

স্বপ্নের জগতে চলে যাচ্ছে ওরা।

নায়কের চওড়া বুকে মুখ ঘষল নায়িকা, আবেশে বুজে এল চোখ, আস্তে কামড় দিল ওর কাঁধে। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। ঠোঁটে জোড়া লেগে গেল ঠোঁট। পাগল হয়ে আদর করছে ওরা পরস্পরকে। আবার হারিয়ে যাচ্ছে অনন্ত আনন্দলোকে।

সময় দাঁড়িয়ে গেল স্তব্ধ হয়ে। দ্রুত শ্বাস।

পুব আকাশে ভোরের আভাস। বালিশময় এলোমেলো ছড়িয়ে আছে নায়িকার মেঘবরণ কেশ। সেই চুলে নাক গুঁজে ঘুম আসছে নায়কের দু'চোখ ভেঙে।

আহ্, কী তৃপ্তি।

ক্যান্সার

সাঁই সাঁই ঝোড়ো হাওয়ার বেগ হঠাৎ স্তিমিত হলো। টিনের চালের উপর ঝনঝন বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে ইমরানের মনে হলো যেন চিৎকারের মত কী একটা কানে এল ওর। একবার মনে হলো, মনের ভুল, টিনের চালে বৃষ্টি পড়লে কান পাতলে অনেক সময় গান-বাজনার সুর শোনা যায়, এটাও নিশ্চয়ই সেই রকমই কিছু—কিন্তু আবার কী মনে করে দরজাটা খুলে উঁকি দিল সে বাইরের নিকষ কালো অন্ধকারে।

সামনেই ফুলে উঠেছে তুরাগ নদী। ফুঁসছে। ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরে, জলের কলোচ্ছ্বাস। ঢেউয়ের মাথায় নাচানাচি করছে ঘাটে বাঁধা ডিঙিটা, ঠুনঠুন শব্দ করছে ডিঙি-বাঁধা শিকল। দূরে নদীর অপর পারের দিকে টর্চ ধরল ইমরান, কিন্তু সাদা সাদা তেরছা বৃষ্টির ফোঁটা ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। বিপুল অন্ধকার বেমালুম গিলে নিয়েছে আলোটাকে।

হঠাৎ আবার কানে এল চিৎকারটা। নদীর দিক থেকেই আসছে আওয়াজ। সাহায্যের আবেদন। লম্বা, সরু, টানা আর্তনাদ। প্রথম কয়েক সেকেণ্ড পরিষ্কার শোনা গেল, তারপর দমকা হাওয়া ঠেলে বাঁকিয়ে অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল আওয়াজটাকে। ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল ব্যাকুল চিৎকার। বৃষ্টির ঝমঝম ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না আর।

এক সেকেণ্ডও দ্বিধা করল না ইমরান। বেড়ার গায়ে ঠেকিয়ে রাখা বৈঠাটা তুলে নিয়ে একলাফে গিয়ে উঠল ডিঙিতে, শিকল খুলে ভেসে পড়ল ঢেউয়ের মাথায়। পরমুহূর্তে ঝপাৎ ঝপাৎ বৈঠা ফেলতে শুরু করল সে, স্রোত আর হাওয়া ঠেলে এগোচ্ছে। মানুষের জীবন বিপন্ন, দ্বিধা করবার সময় এটা নয়।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। ডুবন্ত লোকটার অবস্থান বুঝবার জন্যে হাঁক ছাড়ল ইমরান। কিন্তু কোন উত্তর এল না। যদি কোন উত্তর দিয়েও থাকে, হাওয়া ঠেলে আওয়াজ এসে পৌঁছল না ওর কানে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ভিজে একেবারে চুপচুপে হয়ে গেল ইমরান। আশ্বিন মাস, বরফের মত ঠাণ্ডা বৃষ্টির পানি। সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল ওর। হাড় পর্যন্ত জমে যাওয়ার জোগাড়।

বুকের ভিতর দুর্বল হৃৎপিণ্ডটা অস্বাভাবিক গতিতে লাফাচ্ছে ধুপধাপ। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে সে। ভয় হলো ইমরানের: মরে যাবে না তো সে। ভাবল: তাতে কিছু এসে যাবে? দু'দিন আগে বা পরে, মরতে তো তাকে হচ্ছেই। দাঁতে দাঁত চেপে দুর্বল হাতে বৈঠা বেয়েই চলল সে। টর্চ জ্বেলে দেখবার চেষ্টা করল চারপাশটা। উত্তাল তরঙ্গ…কোথাও কিচ্ছু নেই। আবার ডাকল। দূর থেকে ক্ষীণ উত্তর ভেসে এল। ডানদিক থেকে। ডিঙিটা ডাইনে ঘুরিয়ে আবার পাগলের মত বৈঠা বাইতে শুরু করল সে। ভয়ানক অসুস্থ সে, ব্যথায় ককিয়ে উঠছে থেকে থেকে, বুঝতে পারছে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে শক্তি, তবু মরণপণ করে চোখ বুজে টেনে চলল সে বৈঠা। শরীরের নয়, শুধু মনের জোরে এগোচ্ছে সে এখন।

তিন মিনিট পর দেখতে পেল ইমরান, অসহায় ভাবে হাবুডুবু খাচ্ছে লোকটা, ভেসে যাচ্ছে স্রোতের টানে, ত্রিশ গজ দূরে। কিন্তু এই ত্রিশটা গজ কি এগোতে পারবে সে? পরিষ্কার বুঝতে পারছে, মৃত্যু এসে গেছে। অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। দপদপ করছে কপালের শিরা। কিন্তু এই কষ্টের মধ্যেও ম্লান একটুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। ভালই হবে—ভাবল সে। অকালে শেষ হয়ে গিয়েছে সে কাল-ব্যাধিতে। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে: আর বড়জোর সাতদিন বাঁচবে সে। ধুঁকতে ধুঁকতে শেষ ক'টা দিন কষ্ট পেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে, নিরুপায় ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে অনেক ভাল হচ্ছে এটা। ওর অর্থহীন প্রাণের বিনিময়ে জীবন দিতে চলেছে সে এক স্বাস্থ্যবান তরুণকে—জীবনের মায়া, আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য যার ফুরিয়ে যায়নি। ধুঁকে মরার বদলে অকস্মাৎ এই যুদ্ধ করে মরবার সুযোগ এসে হাজির হওয়ায় ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল সে। এখন আর মৃত্যু এগিয়ে আসছে না পায়ে-পায়ে পরাজিত ইমরানের দিকে, ও-ই বরং বীরের মত হাসতে-হাসতে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করতে।

বড্ডো কষ্ট হচ্ছে। লোহার সাঁড়াশী দিয়ে ওর বুকটা চেপে ধরেছে কে যেন। প্রচণ্ড ব্যথা। আর কতদূর? পাগলের মত বৈঠা চালাচ্ছে ইমরান। নিজের অজান্তেই গোঙানির মত শব্দ বেরোচ্ছে ওর মুখ থেকে। ঢোক গিলবার চেষ্টা করে দেখল শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে জিভ, গলা। চোখ দুটো বেরিয়ে যেতে চাইছে ঠিকরে।

লোক তো না…পরিষ্কার দেখতে পেল ইমরান, দশ গজ দূরে ডুবছে, আবার ভাসছে, আবার ডুবছে এক যুবতী মেয়ে; হাত-পা ছুঁড়ছে ভেসে থাকার আপ্রাণ প্রয়াসে। দপদপ করছে ইমরানের মাথার ভিতরটা। দৃষ্টিটা স্থির থাকতে চাইছে না। কষ্ট হচ্ছে। আর একটু, আর একটু—নিজের মনে উচ্চারণ করল সে।

পৌঁছল ইমরান। একহাতে নৌকার গলুই ধরল মেয়েটা। ওকে সাহায্য করবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে গেল ইমরান। ঠিক সেই সময়ে দপ্ করে সাতটা সূর্য জ্বলে উঠল ওর চোখের সামনে। পরমুহূর্তে সব অন্ধকার। হুমড়ি খেয়ে পড়ল লাশটা পাটাতনের উপর।

ছোট্ট দোচালা টিনের ঘরে নিজের খটখটে চৌকির উপর শুয়ে চোখ মেলল সে। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বেড়ার গায়ে। ঝড়বৃষ্টি কেটে গেছে। জানালার বাইরে শিউলীর ডালে বসে ডাকছে দোয়েল। মিষ্টি বাতাসে ঘুমঘুম তৃপ্তির

আমেজ। উঠে বসবার চেষ্টা করতেই মিষ্টি একটা সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে।

'না না, এখন উঠো না, ইমরান। বিশ্রাম দরকার তোমার। ঘুমোও। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো।'

ঘুমিয়ে পড়ল ইমরান।

ঘুম থেকে উঠে দেখল মেয়েটা ঝুঁকে রয়েছে ওর বুকের উপর। অপূর্ব সুন্দর মুখটা অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল সে চুপচাপ শুয়ে। দক্ষ হাতে ওর বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে মেয়েটা।

'আপনি ডাক্তার?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ইমরান।

'না,' মৃদু হাসি ফুটে উঠল যুবতীর মুখে। 'না, আমি ডাক্তার নই।'

'তা হলে নার্স?' প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারল, নার্স হতেই পারে না। এত সুন্দরী এক মেয়ে নার্স হলে বিয়ে করে নিত কোন না কোন ডাক্তার। মাথা নাড়ল মেয়েটা, যত্নের সাথে বেঁধেই চলেছে ব্যাণ্ডেজ। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর সবকিছু, কথা বলে উঠল ইমরান, 'মরে যাচ্ছিলাম··· না, মরেই গিয়েছিলাম আমি। আপনি···আপনি আমার···'

'চুপ!' একটা আঙুল ঠোঁটে ছোঁয়াল মেয়েটা। আমাকে 'আপনি' বলবার কোন দরকার নেই। আমি তোমার বন্ধু। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ—তুমি আমার বন্ধু। আর কোন কথা নয়, ঘুম দরকার তোমার। ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়ো নিশ্চিন্তে।'

আবার যখন ঘুম ভাঙল, ইমরান দেখল ঘরে ও একা। চারপাশটা দেখে নিয়ে বুঝল, নিজের সেই ঘরটাতেই আছে সে এখনও। ঝড়ের রাতে যেমন দেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনি রয়েছে ঘরটা। চিবুকের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুঝল, অন্তত দুদিন আগের ঘটনা সেটা। অনেকটা ভাল বোধ করছে সে। সেরে গেল নাকি অসুখটা? উঠে বসতে গিয়ে তীব্র ব্যথায় ধপাস করে শুয়ে পড়ল সে আবার। বুকের ভিতর খচ করে উঠেছে সেই তীক্ষ্ণ ব্যথাটা। ক্যান্সার। দু'দিন ওষুধ না পড়ায় আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ব্যথাটা। অতি সাবধানে উঠে বসল সে বিছানার কিনারে। আরও সাবধানে মশারির স্ট্যাণ্ড ধরে উঠে দাঁড়িয়ে দুই পা এগিয়ে টেবিলের কিনারাটা ধরল। পিরিচ ঢাকা গ্লাসের পানিটা বাসি, তবু তাই দিয়েই গিলে নিল সে দুই রকমের দুটো-দুটো চারটে ক্যাপসুল। এতক্ষণে লক্ষ করল, জাঙ্গিয়া ছাড়া আর কিছুই নেই ওর পরনে। বুকের ব্যাণ্ডেজটা টেনে দেখল, বেশ নরম, ইলাস্টিক, কিন্তু শক্ত করে চেপে বাঁধা। ওটাকে আর টানাটানি না করে আলগোছে জামা-কাপড় পরে নিল ও, দরজার বাইরে ছোট্ট বারান্দায় গিয়ে বসল একটা আরাম কেদারায়। সামনে শান্ত নদী। সাদা, নীল, গোলাপী পাল তুলে মিরপুরের দিকে চলেছে কয়েকটা মালবাহী নৌকো। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে, মাছ ধরছে কয়েকটা জেলে নৌকো। সাদা মেঘের পাশে আকাশটা অপূর্ব নীল। ঝিরঝির ঝিরঝির প্রাণ জুড়ানো মিষ্টি হাওয়া। শিউলীর ডালে দোয়েলের শিস। সবটা মিলে বড় ভাল লাগল ইমরানের। কিন্তু সেই সঙ্গে খচ্ করে খোঁচা লাগল মনের মধ্যে—এই সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে আর বেশি সময় পাবে না ও। ডাক্তারদের অনুমান যদি সত্যি হয়, আর বড়জোর পাঁচ দিন। শেষ দেখা দেখে

নেয়ার জন্যে এসেছে সে তুরাগের তীরে শৈশবের এই জিরাবো গ্রামে।

'উঠে পড়েছ দেখছি, ইমরান?' সেই সুরেলা খুশি-খুশি গলাটা ভেসে এল বামপাশ থেকে। 'ভাল, ভাল। ভেরি গুড।'

অপরূপ সুন্দরী সেই মেয়েটা এগিয়ে আসছে জংলাপথ ধরে। শার্ট-প্যান্ট পরেছে পুরুষের মত। চুলগুলো এলো খোঁপায় বাঁধা। হেলেদুলে হাঁটার ভঙ্গিটা বিচিত্র। মুখের চেহারায় কোন রকম ভাবের ছায়া নেই। কাছে এসে দাঁড়াল। আন্তরিক কণ্ঠে বলল, 'কেমন বোধ করছ আজ?'

'ভাল। সামান্য একটু দুর্বল…তাছাড়া ভাল। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার পরিচয়টা…'

'আবার "আপনি"!' ভুরু কুঁচকাল মেয়েটা শাসনের ভঙ্গিতে। 'আমি তোমার বন্ধু। আমাকে "তুমি" করে বলবে। আমার পরিচয়…মানে, আমার নাম…' একটু থেমে বলল, 'আমাকে ইচ্ছে করলে জেসি বলে ডাকতে পার।'

'কোথায় থাকো তুমি, জেসি?'

'ওই জঙ্গলে!' গ্লাভস পরা হাত তুলে জঙ্গলের দিকে দেখাল মেয়েটা। 'বেশ ভাল বোধ করছ, না? অলরাইট। খুলে দেখা যাক ব্যাণ্ডেজটা।'

শার্টের বোতাম খুলে দক্ষ হাতে ব্যাণ্ডেজটা কেটে ফেলল জেসি ব্লেডের মত দেখতে ধারালো একটা স্টিলের পাত দিয়ে, সবুজ রঙের দু'ইঞ্চি চওড়া ইলাস্টোপ্লাস্ট টেনে তুলল চড়চড় করে। চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে, কিন্তু মুখে কোন ভাবান্তর দেখতে পেল না ইমরান।

'তিনদিনে তো সেরে যাওয়া উচিত ছিল! মারাত্মক কোনও অসুখ আছে নাকি তোমার ইমরান—এত দুর্বল কেন শরীর? প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রায় নিল্! আরও পুরো দুটো দিন লাগবে এই ঘা শুকোতে।'

সামনে ঝুঁকে হৃৎপিণ্ডের কাছে একটা চওড়া কাটা দাগ দেখতে পেল ইমরান। তাজ্জব হয়ে গেল সে।

'অপারেশন করতে হয়েছিল?' বিস্ফারিত চোখে জেসির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল ইমরান।

'অপারেশন? তা, ইচ্ছে করলে এটাকে অপারেশন বলতে পার।'

'আরিব্বাপ! আবার চালু করবার জন্যে ম্যাসেজ করতে হয়েছিল বুঝি হৃৎপিণ্ডটাকে?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল জেসি। 'ম্যাসেজে কাজ হতো না কিছুই। ওই হার্ট আর চালু করবার উপায় ছিল না…একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল ওটা।'

'কিন্তু…ঠিক বুঝতে পারছি না…'

'ঠিক আছে, দেখাব তোমাকে। আগে এটা লাগিয়ে নিই।'

দ্রুতহাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল জেসি আবার, হেলেদুলে চলে গেল জঙ্গলের দিকে। চুপচাপ বসে রইল ইমরান। মেডিকেল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র ছিল সে, এসব সম্পর্কে সাধারণের চেয়ে ওর অনেক বেশিই জানবার কথা, কিন্তু এই ব্যাপারটায় একেবারে বোকা হয়ে গিয়েছে সে। আগা মাথা কিছুই বুঝতে পারছে না। বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল, আধঘণ্টা হয়ে গেল, তারপর সেই একই ভঙ্গিতে

হেলেদুলে ভবন থেকে বেরিয়ে এল জেসি, হাতে একটা স্বচ্ছ কাঁচের জার। ইমরানের চোখের সামনে তুলে ধরল সে জারটা।

'দেখছ? একেবারে বিকল হয়ে গিয়েছিল হার্টটা।'

বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ইমরান। জারের মধ্যে সত্যিই রয়েছে একটা মানুষের হৃৎপিণ্ড।

'তু-তুমি বলতে চাও এটা আমার···মানে, হার্টটা···'

'তোমারই। তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

হাসতে শুরু করল ইমরান। মেয়েটা যে পাগল তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিংবা একেবারে ছেলেমানুষ। হাসতে হাসতে বলল, 'তা হলে বেঁচে আছি কি করে?' কথাটা বলেই নিজের বুকে হাত দিল সে, চোখ মুছল, চট করে পাল্‌স্ পরীক্ষা করল বাম হাতের কব্জি চেপে ধরে। মুহূর্তে মুখ শুকিয়ে চুন হয়ে গেল ওর, মিলিয়ে গেল হাসি।

'বদল করে দিয়েছি,' গম্ভীরভাবে বলল জেসি। 'বদল করে আরেকটা লাগিয়ে দিয়েছি আমি।'

'তবে যে বলছিলে, তুমি ডাক্তার নও?'

'ডাক্তার তো নই-ই। ওরেব্বাপ, ডাক্তারি হচ্ছে অনেক অ্যাডভান্সড ব্যাপার। এটাকে ডাক্তারি বলে না। হার্টের ব্যাপারটা অনেকটা··· তোমাদের ভাষায় যাকে বলে ইঞ্জিনিয়ারিং, সেই কাজ। তাও আবার উঁচুদরের কিছু নয়।'

'ভেতরে যে চলছে···' বুকের উপর আঙুল ঠেকাল ইমরান, 'এটা নিশ্চয়ই পাম্প জাতীয় কিছু?'

'ঠিক। আরেকটা পাম্প লাগিয়ে দিয়েছি আমি তোমার বুকে।'

'কেমন পাম্প? ভাল?' আবার পাল্‌স্ পরীক্ষা করল ইমরান। নেই। কোন বিট নেই।

'অনেক ভাল,' বলল জেসি হাসিমুখে। 'এটা কোনদিন ক্ষয় হবে না।'

'ঠিক আছে,' বলল ইমরান। 'যাই করে থাকো না কেন, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এসব যদি চোখের বা মনের ভুল হয়, তবু তোমাকে ধন্যবাদ। সেদিন ঝড়ের রাতে নদীর বুকে বৈঠা বাইতে বাইতে মরি কি বাঁচি খুব একটা কেয়ার করিনি। কিন্তু এই উজ্জ্বল দুপুরে পৃথিবীটাকে অনেক সুন্দর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারলে মন্দ হতো না। কাজেই তোমাকে ধন্যবাদ।'

'না, না। আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কিছুই নেই, ইমরান। বরং আমিই ধন্যবাদ দেব তোমাকে। আমরা দু'জনেই দু'জনের জীবন রক্ষা করেছি, ঠিক, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার ঋণ তোমার চেয়ে অনেক বেশি। তুমি আমাকে না বাঁচালে আমি তোমাকে সাহায্য করবার সুযোগই পেতাম না। যাই হোক, এখন চলি, বেশ কিছু কাজ পড়ে আছে···সন্ধের সময় আসছি আমি আবার।'

হেলেদুলে চলে গেল সে কাঁচের জারটা হাতে নিয়ে।

সাতদিনের মধ্যে শুধু একটা চিকন চেরা দাগ রইল কেবল, বুকের ক্ষত শুকিয়ে

গেল। কিন্তু আসল অসুবিধে যেটা, সেটা তীব্রতর হয়ে উঠল। লাঙ-ক্যান্সারের ফলে বুকে অসহ্য ব্যথা ছিল, ওষুধ খেয়ে ব্যথা ভুলে থাকত ইমরান—কিন্তু এখন ব্যথার ওষুধ আর কোন কাজ করছে না কেন যেন, সামান্য নড়াচড়া করলেই অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে ওর। ঠায় বসে বা শুয়ে থাকলে কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু সামান্য একটু নড়তে গেলে নিজের অজান্তেই কাতরানি বেরিয়ে আসছে মুখ দিয়ে। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় দেখা করতে আসে জেসি, কথায়-বার্তায় যতটা সম্ভব ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করে ওকে। কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলল যন্ত্রণার মাত্রা।

'আর পারছি না, জেসি,' বলল সে একদিন দাঁতে দাঁত চেপে। 'কাল সকালেই যেতে হবে আমাকে জাফর সাহেবের ওখানে। এই ব্যথার কিছু একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে আত্মহত্যা করতে হবে আমার।'

'ঠিক আছে, এক কাজ করা যাক। লোকজনের সামনে আমি যাই না, কিন্তু খুব ভোরে তোমাকে আমি বড় রাস্তার পাশে রেখে আসতে পারব। ওখান থেকে নিজে ব্যবস্থা করে নিতে পারবে না?'

'বড় রাস্তা পর্যন্ত যাওয়ার দরকার হবে না,' বলল ইমরান। 'ডেয়ারি ফার্মের কাছে যদি কোন মতে পৌঁছতে পারি তা হলে আর কোন চিন্তা নেই। ম্যানেজার আমার খালু। গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পৌঁছেও দিয়ে যাবে ওরাই।'

'ঠিক। কাল খুব ভোরে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব আমি।'

পরদিন আঁধার থাকতে এসে হাজির হলো জেসি। ইমরানকে পিঠে তুলে অনায়াসে বয়ে নিয়ে গেল তিন মাইল। ডেয়ারি ফার্মের পাশে ঘাসের উপর নামিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল দ্রুতপায়ে। আধঘণ্টার মধ্যেই ওকে দেখতে পেল মালী, মালী গিয়ে খবর দিল দারোয়ানকে, দারোয়ান দৌড়ে গিয়ে খবর দিল ম্যানেজারকে; গাড়ি এল, এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল সে ডক্টর জাফরের ক্লিনিকে।

প্রথমেই একনাগাড়ে বকাবকি করে নিলেন ডক্টর জাফর, হাজার বার করে বলা সত্ত্বেও ক্লিনিকে ভর্তি না হওয়ার জন্য আজকালকার বখাটে ছেলেদের গুষ্ঠি উদ্ধার করলেন, তারপর খসখস করে লিখে দিলেন, এই মুহূর্তে ব্লাড, ইউরিন টেস্ট করাতে হবে, এক্স-রে নিতে হবে বুকের। আধঘণ্টার মধ্যে এসব রিপোর্ট নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে—তার আগে বেয়াদব ছাত্রের কোনও কথা শুনতে চান না তিনি।

আধঘণ্টার মধ্যে ইমরানের খালুর কাছে জেনে নিয়েছেন তিনি সব, ইমরান রিপোর্টগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকতেই আরও একপশলা গালি বর্ষণ করে আদর করে পাশে বসালেন ওকে ডাক্তার। এক্স-রে রিপোর্ট দেখে ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল বৃদ্ধ ডাক্তারের, ব্লাড রিপোর্ট দেখে আরও ঘন হলো কাঁচা-পাকা ভুরু। মাথা নাড়লেন সবেগে।

'কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, ইমরান। লাংসের কণ্ডিশন যা ছিল তার চেয়ে একবিন্দু খারাপ হয়নি। ইমপ্রুভও করেনি, কিন্তু আর এক পা-ও আগে বাড়েনি ভাইরাস। টিশু গ্রোথ যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। আশ্চর্য! রক্তটাই বা এত পাতলা হয়ে গেল কি করে?'

'আমার প্রব্লেম, স্যর, ব্যথা,' বলল ইমরান। 'কোনও ওষুধে কাজ হচ্ছে না কেন? ওষুধ চেঞ্জ করে দেখব?'

'করে দেখতে পারো। কিন্তু যেটা খাচ্ছ, তাতে তো কাজ হওয়ার কথা!' বলেই খসখস করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন ডাক্তার। 'আর একটা কথা। এবার ভর্তি হয়ে যাও। সারাক্ষণ তোমার কাছে লোক থাকা দরকার। যে-কোন সময় যা-তা কিছু হয়ে যেতে পারে। একা-একা ওই নদীর ধারে পাগলামি না করে এবার তোমার চলে আসা দরকার ওখান থেকে। আজ না হয় কোন মতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ডেইরি ফার্ম পর্যন্ত এসেছিলে, এর পর দশ কদমও হাঁটতে পারবে না, ওখানেই মরে পড়ে থাকবে।'

'ওখানেই মরতে চাই, স্যর।'

'দেন গো অ্যাণ্ড ডাই দেয়ার, বেয়াদ্দব, বেয়াল্লিশ, ঘাড়ত্যাড়া, বোকা, জানোয়ার ছেলে কোথাকার! দেখি, পালস্‌টা দেখি?' হাত বাড়ালেন ডাক্তার ইমরানের দিকে।

ঘাবড়ে গেল ইমরান। চট করে প্রেসক্রিপসনটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল মুখটা। দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিয়ে বলল, 'ঠিকই আছে স্যর। একটু আগেও চেক করেছি।'

'এদিকে এসো বলছি!' হাঁক ছাড়লেন ডাক্তার। কিন্তু ততক্ষণে দরজার সামনে চলে গিয়েছে ইমরান। রাগের ঠেলায় তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। 'এভাবে শুধু ওষুধ খেলে কোন কাজ হবে না, ছোকরা। তোমার তো চিকিৎসার দরকার দেখতে পাচ্ছি না আমি। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ওষুধ না, তোমার দরকার পাছার ওপর গোটা তিনেক বেতের বাড়ি—তবে যদি তোমাকে পথে আনা যায়। নিজে ভুগবে, মানুষকে ভোগাবে...'

ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে ইমরান। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে সে এ যাত্রা। পালস্ দেখতে দিলেই মহা হুলস্থুল বেধে যেত এখুনি। বুকের কাছে কাটা দাগ কীসের, হার্টবিট নেই কেন, কী করে কি হলো তার জবাবদিহি করেও নিষ্কৃতি পেত না সে। আঁটি ভেঙে শাঁস খাওয়ার অভ্যাস এই বুড়ো ডাক্তারের—কিছুতেই ছাড়া পাওয়া যেত না এর হাত থেকে, বলতেই হতো সব। ফলে টানাহেঁচড়া পড়ে যেত জেসিকে নিয়ে। অথচ গোপনীয়তার ব্যাপারে সে জেসির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কোনও মতে টলতে টলতে জীপে গিয়ে উঠল সে। তিন মিনিট পর খালুও এসে উঠলেন গম্ভীর মুখে। ওষুধ কেনা হলো, যদিও আরও চোদ্দ দিনের খাবার রয়েছে। ঘরে তবু আরও কিছু শুকনো খাবার কিনে পৌঁছে দেয়া হলো ওকে নদীর ধারে ওর টিনের ঘরে।

কাজ হলো না। সারাদিনে তিন ডোজ খেয়ে বুঝে গেল ইমরান, নতুন ওষুধেও কাজ হবে না কিছু। সামান্য একটু নড়াচড়া করলেও খচ্‌খচ্ ছুরি বিঁধছে বুকের ভিতর। বারান্দায় আর্মচেয়ারে বসে নদীর দিকে চেয়ে-চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবল ইমরান, কূল পেল না কোথাও। সন্ধে লাগতেই হেলেদুলে বেরিয়ে এল জেসি জঙ্গল থেকে। উজ্জ্বল, ফর্সা, কাটা চেহারা—মুখে হাসি।

'ফিরেছ তা হলে,' বলল জেসি। 'দুপুরে একবার এসে খোঁজ নিয়ে

গিয়েছিলাম। অসুখ ধরা পড়েছে? বেশ চিন্তাতেই পড়েছিলাম। ওষুধ খেয়েছ? সরল ব্যথা?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ইমরান। 'নাহ্, কাজ হলো না কিছু। বুঝতেই পারল না ডাক্তার কেন কাজ হচ্ছে না ব্যথার ওষুধ খেয়ে। নাড়ি পরীক্ষা করতে চাইল যখন, চলে আসতে বাধ্য হলাম।'

'আমার পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাবে, তাই?'

মাথা ঝাঁকাল ইমরান। পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল দু'জন নদীর দিকে। তারপর ইমরান ডাকল, 'জেসি।'

'বলো, বন্ধু।'

যা বলতে চায় সেকথা কীভাবে বলবে বুঝে উঠতে পারল না ইমরান কিছুক্ষণ। তারপর আকাশের একটা দুটো করে জ্বলে ওঠা তারার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওখান থেকে এসেছ তুমি, তাই না?'

একটু ইতস্তত করল জেসি, তারপর বলল, 'না, ঠিক ওদিকটায় না।' আঙুল তুলে উত্তরের আকাশ দেখাল সে। 'আমি এসেছি ওই দিক থেকে। কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে?'

'অনেক ভাবে। আমার বুকের ভেতর আশ্চর্য এক হৃৎপিণ্ড ঢুকিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছ তুমি আমাকে মৃত্যুর পর···এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? কিন্তু এছাড়াও আরও কয়েকটা জিনিস লক্ষ করেছি আমি। তোমার ঘাড়ের পিছনে চুল দিয়ে ঢাকা চোখটা দেখে ফেলেছি আমি। লক্ষ করেছি, তোমার হাত-পায়ের আঙুল পাঁচটা নয়, ছ'টা করে। তাছাড়া···'

নিজের ছয় আঙুলের হাতটা চোখের সামনে তুলে হাসল জেসি। 'বেশি মনে হচ্ছে? আমার কাছে কিন্তু তোমাদেরগুলো কম বলে মনে হয়।'

'কেন এসেছ তুমি এখানে?'

'এখানে মানে সাভারের এই অঞ্চলে, নাকি এই পৃথিবীতে?'

'প্রথমে এই অঞ্চলের কথাই ধরা যাক।'

'এখানে এসেছি আমি বিশ দিন হলো। চলে যাব কয়েকদিন পরেই। এর আগে সারা পৃথিবীতে ঘুরেছি আমি, সব জায়গায়। সমস্ত জায়গা থেকে তথ্য আর নমুনা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি আমি গত ছয়টা মাস যাবৎ।'

'কেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল এবার ইমরান। 'আক্রমণ করবে তোমরা পৃথিবীকে? দখল করবার চেষ্টা করবে?'

'আক্রমণ!' অবাক হলো জেসি। 'এতদূরের একটা গ্রহ আক্রমণ করে আমাদের কী লাভ? আমাদের কাছেপিঠে আরও অনেক বাসোপযোগী গ্রহ রয়েছে···তোমরা তো তাও বেশ অনেকটা এগিয়েছ জ্ঞান-বুদ্ধির দিক থেকে, এমন অনেক গ্রহ রয়েছে যেখানে মানুষ তো দূরের কথা, বাঁদরের সমান বুদ্ধিও নেই কোন জীবজন্তুর মধ্যে। না, আক্রমণের প্রশ্নই ওঠে না। আমি এসেছি এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কিছু তথ্য, আর কিছু নমুনার জন্য। থিসিস করছি একটা। আমি চলে যাওয়ার পর এমনও হতে পারে, আমাদের ওখান থেকে আর কেউ কোনদিন এখানে আসবার প্রয়োজন বোধ করবে না। আমি জায়গায় জায়গায় যন্ত্র

বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, ঘরে বসেই আমরা জানতে পারব তোমাদের সম্পর্কে সবকিছু।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ইমরান, তারপর মুখ খুলল।

'বুঝলাম। এবার বলো তো, আমার হার্টটা যখন ঠিক করেছিলে তখন আর কী করেছিলে তুমি আমার শরীরে?'

'তোমার হার্ট আমি ঠিক করিনি, ইমরান। ওটা একেবারেই অচল ছিল। আমি নতুন একটা লাগিয়ে দিয়েছি কেবল।'

'আমার রক্ত এত পাতলা হয়ে গেল কেন?'

'আমি কয়েকটা কেমিক্যাল্‌স্ মিশিয়ে দিয়েছি তোমার রক্তের সাথে। তা নইলে নতুন পাম্পটা চালু রাখা যাচ্ছিল না। তোমাদের রক্ত অনেক বেশি ঘন, একটুতেই জমাট বেঁধে যায়। এখন আর তা হবে না।'

'কিন্তু জমাট বাঁধতে না পারলে তো শরীরের কোথাও সামান্য কাটলে আর শুকাবে না, রক্ত পড়তে পড়তে...'

'না। সেই অবস্থায় আগের চেয়েও তাড়াতাড়ি জমে গিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ভেইন, আর্টারি আর হার্টে কোনও দিন রক্ত জমাট বাঁধবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'কিছু কিছু। তুমি এত জান, এত বোঝ, হার্ট বদলে দিতে পার, রক্ত পানি করে দিতে পার—কিন্তু আবার বলছ তুমি ডাক্তার নও, এ ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না আমি কিছুতেই।'

'আমাদের ওখানে ডাক্তারি পাস করতে হলে একেকজনকে পড়াশোনা করতে হয় তোমাদের হিসেবে দেড় হাজার বছর। আমার বয়সই মাত্র বারোশো বছর...কি করে ডাক্তার হব? রক্ত হচ্ছে কেমিস্ট্রির ব্যাপার, সেটা আমি বুঝি; হার্ট পাল্টে দেয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, সেটাও বুঝি—ডাক্তারির কিছুই আসলে জানি না।'

আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ইমরান। তারপর হঠাৎ বলল, 'তোমার ওই কেমিক্যালের জন্যেই এই অবস্থা হয়েছে আমার। ব্যথা দূর করবার কোন ওষুধ আর ধরছে না আমাকে।'

'আসলে তোমার রোগটা কি বলো দেখি?'

ক্যান্সার সম্পর্কে বিস্তারিত বলল ইমরান। সব শুনে দুঃখিত ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জেসি। কোন প্রতিকার জানা নেই ওর। সন্ধে ঘনিয়ে আসতেই বিদায় নিয়ে চলে গেল সে জঙ্গলের দিকে।

ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল জেসি। নিজের গ্রহে, নিজের দেশে, নিজের মানুষের মধ্যে ফিরে যাবে বলে খুব খুশি। এখানে গবেষণা শেষ, তথ্য ও নমুনা সংগ্রহের কাজও প্রায় শেষ—এখন বড় কিছু জন্তুর নমুনা নিতে পারলেই ফিরে যাবে সে। যথাসাধ্য সাহায্য করল ইমরান। ডেইরি ফার্মের দারোয়ানের সাহায্যে সংগ্রহ করে দিল দুই জোড়া করে ভাল জাতের মহিষ, গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, এমন কি গোটা কয়েক কুকুর ও বিড়ালও। টাকা যা লাগল, জেসিই দিল। এত টাকা ও কোথায় পেল জিজ্ঞেস করবে ভেবেও অভদ্রতা হয়ে যায় মনে করে চেপে

গেল ইমরান।

সন্ধে লাগলেই আসে জেসি, জোড়ায় জোড়ায় জানোয়ারগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে যায় জঙ্গলের দিকে। একদিন জিজ্ঞেস করল ইমরান, 'এতসব আঁটবে? বিরাট স্পেসক্রাফট নিয়ে এসেছ মনে হচ্ছে?'

'না, তেমন বড় না,' বলল জেসি মুচকি হেসে। 'ধরতে গেলে বেশ ছোটই।'

'তা হলে এসব জন্তু জানোয়ার আঁটবে কি করে? সেদিন না বলছিলে বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতী, সব নিয়েছ? ছাল ছাড়িয়ে শুধু চামড়াটা নিচ্ছ?'

'না, না। আস্ত জন্তুই নিয়ে যাচ্ছি।'

'জায়গা হবে এতগুলোর?'

'সেটা কোন সমস্যাই নয়,' বলল জেসি একগাল হেসে। 'প্যাকিঙের সমস্যা আমরা সমাধান করেছি প্রায় পঁচাত্তর হাজার বছর আগে। কিছু চিন্তা কোরো না, সব এঁটে যাবে।'

তিনবার ওষুধ বদলেও কোন ফল পাওয়া গেল না। ব্যথাটা কমা তো দূরের কথা, বেড়েই চলেছে দিন দিন। একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল ইমরান। সামান্য নড়লেই মনে হয় চারপাশ থেকে একশোটা আলপিন ফুটছে বুকের ভিতর। চার সপ্তাহে চারবার এক্স-রে করে দেখা গেছে আর এক কদমও আগে বাড়তে পারেনি ক্যান্সারের টিশু সেল, অর্থাৎ, মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়ে গেছে ইমরান, এগোতেও পারছে না, পিছোতেও পারছে না। এই সঙ্কটজনক অবস্থায় পড়ে দুর্বিষহ হয়ে উঠল ইমরানের জীবনটা। ঘন ঘন আসছে জেসি, মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন নেই, কিন্তু তার কাজেকর্মে পরিষ্কার বোঝা যায়, ইমরানের এই দুর্ভোগের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করে গভীর অনুশোচনায় ভুগছে সে।

রোজ তিন চারবার করে এসে টিন খুলে খাবার খাইয়ে দিয়ে যায় সে, গ্লাসে করে পানি রেখে যায় বিছানার পাশের টেবিলে, সাধ্যমত সেবা শুশ্রূষা করছে সে ইমরানের, চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব ওর কষ্ট লাঘবের।

'জেসি,' এক সন্ধ্যায় ডাকল ইমরান।

'বলো, বন্ধু।' বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল মেয়েটা।

'পেলে কিছু?'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জেসি। 'অনেক বই ঘাঁটলাম। কোন উল্লেখ নেই কোথাও। আমাদের ওখানে এই রোগ নেই।' আমতা আমতা করে বলল, 'আমি দুঃখিত।'

আশার আলো নিভে গেল ইমরানের চোখ থেকে। মনে মনে আশা করেছিল সে, কিছু না কিছু ব্যবস্থা হয়তো করতে পারবে জেসি। ভেবেছিল, যে অতি সহজে ওর হার্ট কেটে ফেলে দিয়ে আর একটা পাম্প লাগিয়ে দিতে পারে, রক্তের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে, সে নিশ্চয়ই চলে যাওয়ার আগে ক্যান্সারের ব্যাপারেও কিছু না কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে। নিদেনপক্ষে ব্যথা দূর করবার একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারবে জেসি। কিন্তু ওর শেষ কথা শুনে মনটা একেবারেই ভেঙে গেল ইমরানের। অনেক কষ্টে হতাশা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করল

সে, কিন্তু আয়নার মত পরিষ্কার দেখতে পেল জেসি সেই প্রচেষ্টা। মাথা নিচু করে বসে রইল সে কয়েক মিনিট, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'সত্যিই আমি দুঃখিত, ইমরান। তোমার জন্যে সাধ্যমত সবকিছু করতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু যা আমার জ্ঞানগম্যির বাইরে সে ব্যাপারে কোনকিছুই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে বুঝতেই পারছি না আমি। তোমার রক্তের মধ্যে ওই কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডটা মিশিয়েই এই কষ্টের মধ্যে ফেললাম আমি তোমাকে।'

'অবস্থা কি দিন দিন আরও খারাপ হতে থাকবে?'

'জানি না। বিশ্বাস করো, এ ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। তবে আমার মনে হয়, নড়াচড়া করতে পারছ না, সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে হচ্ছে বিছানায় ইনভ্যালিডের মত···এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ইমরান। 'ঠিকই বলেছ, এখন বাঁচা মরা আমার কাছে সমান। যাই হোক, একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে বলো দেখি, এই যে নতুন পাম্প, আর রক্তের মধ্যে নতুন কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড···এসবের ফলে কতদিন বাঁচব বলে আশা করতে পারি?'

'সেটা কি কেউ কখনও বলতে পারে? জীবন হচ্ছে একটা প্রদীপের কাঁপা শিখার মত, দৈবের সামান্য ফুৎকারেই নিভে যেতে পারে যখন-তখন। কার কখন ডাক পড়বে কেউ বলতে পারে? এই তো সেদিন ডুবে মরছিলাম আমি তোমাদের এই নদীতে। তুমি দয়া করে রক্ষা না করলে যেতাম শেষ হয়ে সেইদিনই।'

'সেটা তো বুঝলাম,' একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ইমরান। 'দুর্ঘটনার কথা আলাদা···এমনিতে কতদিন বাঁচব বলে আশা করা যায়?'

'দুর্ঘটনা না ঘটলে মরতে যাবে কোন্ দুঃখে?' অবাক হয়ে চাইল জেসি ইমরানের মুখের দিকে। 'সেক্ষেত্রে তো মরবে না তুমি। এই নতুন পাম্প বন্ধ হবে না কোনদিন, কোনদিন ক্ষয় হবে না।'

স্থির দৃষ্টিতে টিনের ছাতের দিকে চেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল ইমরান। দু'চোখ বেয়ে টপটপ কয়েক ফোঁটা পানি ঝরে পড়ল বালিশে। চট করে ওর একটা হাত ধরল জেসি।

'বন্ধু, কাঁদছ?'

কোন জবাব দিল না ইমরান। এই তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকা আর নরক ভোগ করবার মধ্যে তফাৎ কী? উপকারের প্রতিদান দিতে গিয়ে এ কী ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ফেলল ওকে ভিন-গ্রহের মেয়েটা? অথচ ওরও দোষ নেই। ও কী করে জানবে কী অসহ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এক মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচিয়ে তুললে? বরে শাপ হবে জানলে নিশ্চয়ই এভাবে বাঁচিয়ে তুলত না জেসি ওকে। কিন্তু তাই বলে কষ্টেরও তো কোন সুরাহা হচ্ছে না।

'আমার রক্তের মধ্যে থেকে কেমিক্যালস বের করে নেয়া যায়?' জিজ্ঞেস করল সে ধরা গলায়।

'চেষ্টা করলে হয়ত যায়,' বলল জেসি। 'কঠিন হবে, কিন্তু সম্ভব। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই অকেজো হয়ে যাবে নতুন পাম্পটা। রক্তের ঘনত্ব···'

'বেশি থাকলে বন্ধ হয়ে যাবে, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার পুরানো হৃৎপিণ্ডটা আবার লাগিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে?'

খানিক ইতস্তত করল জেসি।

'তোমার স্মৃতি হিসেবে তোমার হৃদয়টা নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম আমি সাথে করে, কাঁচের জারে রেখে দিয়েছিলাম যত্ন করে—' মাথা নিচু করল জেসি, '—বিড়ালে খেয়ে নিয়েছে।' আবার মুখ তুলল, 'কিন্তু ওটা তো একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ইমরান। ওটা আবার লাগিয়ে দেয়া আর তোমাকে নিজ হাতে খুন করা যে একই কথা হত।'

'সেটাই কি ভাল হত না?' তিক্ত কণ্ঠে বলল ইমরান। 'আমার ভবিষ্যৎটা চিন্তা করে দেখো একবার। হাঁটাচলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি আমি। কদিন পরে উঠে বসবারও ক্ষমতা থাকবে না। কী অবস্থা হবে তখন আমার? কার গলগ্রহ হয়ে থাকব আমি সারাটা জীবন? অত টাকাও নেই আমার যে বছরের পর বছর শুয়ে থাকব কোন নার্সিংহোমে··· কত বছর তা আল্লাই জানে! এই জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল না?'

'টাকার ব্যাপারটা আমি হয়ত তোমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল জেসি। 'কয়েক লক্ষ টাকা রয়ে গেছে এখন আমার হাতে, অথচ আর একটা পয়সাও দরকার নেই আমার—ওগুলো তোমাকে দিয়ে যেতে পারি আমি। যদি নাও···'

'টাকার ব্যবস্থা না হয় হলো, কিন্তু আমার জীবনটা কি দাঁড়াচ্ছে কল্পনা করতে পার? চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে হবে আমার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর···নড়বার উপায় নেই, মরবার উপায় নেই···অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে আমার, চিরকাল!'

'আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই পৃথিবীর মানুষ আবিষ্কার করে ফেলবে ক্যান্সারের ওষুধ, তখন আবার সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি, ভাইরাসগুলো মারা পড়লে আপনিই সেরে উঠবে ধীরে ধীরে।' মিনতির মত শোনাল জেসির কথাগুলো। ও বুঝতে পারছে ইমরানের মনের মধ্যে কী চিন্তা চলছে। বলল, 'নড়াচড়া না করলে তো আর ব্যথা লাগছে না···যদি দাঁতে দাঁত চেপে এই পঞ্চাশটা বছর···'

'তোমাকে বোঝাতে পারব না আমি, জেসি। তোমার পঞ্চাশ আর আমার পঞ্চাশ বছরে যে কত তফাৎ সেটা বোঝানো সম্ভব নয়। যাই হোক, তোমার তো কোনও দোষ নেই। মনে কোন দুঃখ নিয়ো না। বুঝতে পারছি, আমার সামনে দুটো মাত্র পথ খোলা রয়েছে এখন।'

'কী পথ?'

'হয় ভবিষ্যতে সেরে উঠতে পারি সেই আশায় অনিশ্চিত সময়ের জন্যে কোন নার্সিংহোমের বেডে শুয়ে এই নির্যাতন সহ্য করা, নয়ত আত্মহত্যা করে সব কিছুর সমাপ্তি টানা।'

'না!' বিস্ফারিত চোখে চাইল জেসি ইমরানের মুখের দিকে। কিছুক্ষণ আর কোন কথাই বলতে পারল না। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল সে কয়েক মিনিট, তারপর নিচু গলায় বলল, 'কবে নাগাদ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তুমি?'

'কেন?'

'কাল সন্ধের দিকে রওনা হয়ে যাব মনে করেছিলাম। কিন্তু তোমার সিদ্ধান্ত না জেনে যেতে পারব না আমি এই পৃথিবী ছেড়ে।'

'সারারাত আজ ভাবব আমি,' বলল ইমরান। 'কাল সকাল নাগাদ যদি কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পারি তা হলে কোনদিনই পারব না। তোমার দেরি করতে হবে না, কালই জানাতে পারব আশা করি।'

মাথা ঝাঁকাল জেসি, ইমরানের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে চলে গেল জঙ্গলের দিকে।

আকাশপাতাল ভাবল ইমরান সারারাত। মৃত্যুর কথা ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে আকাশ, নদী, মাঠ, পাহাড়, জঙ্গল, ঘাস, লতা আর ফুল··· অপরূপ সব দৃশ্য, মনে পড়ে কত মধুর সব কথা··· 'পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়···' জীবনের সব রঙ, সব মধু, সব মায়া মন ভুলাতে চায়; বুঝতে পারে, কত গভীরভাবে ভালবাসে সে জীবনকে। যতক্ষণ নড়াচড়া না করছে, ততক্ষণ এই অনুভূতি প্রবলভাবে দোলায় ওকে। কিন্তু যেই পিঠ ব্যথা হয়ে এলে পাশ ফিরতে যায়, অমনি জীবনের ভয়ঙ্কর দিকটা লাফ দিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। নিরুপায় অবস্থায় দিনের পর দিন এই যন্ত্রণা ভোগ করবার কথা কল্পনাও করা যায় না। এইভাবে প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখবার কোন অর্থ আর থাকে না তখন, মনে হয় আত্মহত্যাই এর একমাত্র সমাধান। কোন নার্সিংহোমে ভর্তি হলে আত্মহত্যার সুযোগও সীমিত হয়ে যাবে, কাজেই যা করবার আগেই করতে হবে ওর। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে হবে একটা কিছু।

কিন্তু পারা গেল না। পুবের আকাশ ফর্সা করে দিয়ে সূর্য উঠল, জেসি এসে ওকে নাস্তা খাইয়ে গেল, দুপুরে এসে খাবার খাইয়ে গেল—একটি প্রশ্নও করল না ওর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে। বুঝতে পেরেছে সে, এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে শুধু একটা রাতই যথেষ্ট নয়, হাতে সময় যখন নেই, এরই মধ্যে যতটা সম্ভব সময় দিতে হবে ওকে। সন্ধের খানিক আগে এসে বসল সে ইমরানের পাশে। হাত রাখল ওর কাঁধে।

'কি ঠিক করলে?'

'কিছুই ঠিক করতে পারিনি এখনও। তবে একটা রাস্তা বের করেছি ভেবে। বুঝতে পেরেছি, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।'

'কিছুই সিদ্ধান্ত নিতে পারনি?'

'নাহ্। একটা পয়সা নিয়ে টস্ করে দেখা যায়, কিন্তু···'

'আরও সময় নাও না কেন? আরও দুটো দিন থেকে যাই আমি।'

'তাতে লাভ নেই। যত বেশি সময় দেয়া যাবে ততই ভারি হবে দুই দিকের যুক্তির পাল্লা, আরও দুরূহ, জটিল হয়ে যাবে কোন কিছু স্থির করা। কষ্ট হয় হোক, তবু ভবিষ্যতে রোগমুক্তির আশায় অনিশ্চিত সময়ের জন্যে অকর্মা অবস্থায় টিকে থাকব, নাকি মরে যাব—সেটা ভেবেচিন্তে স্থির করবার সাধ্য আমার নেই। তাই সিদ্ধান্তের ভারটা আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিতে চাই।'

'আমার ওপর?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ইমরান।

একেবারে চমকে গেল জেসি। এই একটি কথায় যেন ওর ভিত-পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে ইমরান। বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর চোখ জোড়া, কয়েকটা বিদঘুটে ভাঁজ পড়ল ওর অপূর্ব সুন্দর মুখে। তোতলাতে শুরু করল সে।

'আ-আমার ওপর···দেখো, বন্ধু···আ-আমি কি করে তোমার জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব! এটা···এটা মস্ত অন্যায়···এ ভার তুমি আমার ওপর চাপাতে পারো না।'

'পারি,' শান্ত কণ্ঠে বলল ইমরান। 'তুমি সাহায্যের জন্যে হাঁক ছেড়েছিলে, আমি তোমাকে বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তো তোমার কাছে কোন সাহায্য চাইনি, জেসি। তুমি অযাচিতভাবে বাঁচিয়েছ আমাকে। তার ফলে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা তুমিও চাওনি, আমিও চাইনি। তোমার কাজের জন্যে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ভার তোমার নিজেরই নেয়া উচিত। আমি তোমার ওপর কোনকিছু চাপাচ্ছি না। জেসি, ভেবে দেখ, আসলে তুমিই চাপাচ্ছ আমার ওপর। এ গুরুভার বইবার ক্ষমতা আমার নেই। সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। ইচ্ছে করলে একটা দশ-পয়সা নিয়ে টস্ করে দেখতে পারো কী রায় দেয়া যায়—আমার কোন আপত্তি নেই।'

ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল জেসি, দুর্বোধ্য এক ভাষায় গড়গড় করে কী সব বলল, তারপর সামলে নিয়ে ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল কয়েক মিনিট, ঘন ঘন মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। মর্মাহত দৃষ্টিতে ইমরানকে দেখল বার কয়েক আপাদমস্তক, তারপর হঠাৎ বলল, 'ঠিক আছে! তাই হবে! আমিই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তা হলে!'

এক ঝটকায় পিঠে তুলে নিল সে ইমরানকে, ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ইমরান, কিন্তু কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দ্রুতপায়ে ছুটল জেসি জঙ্গলের দিকে।

গাজামা ইউনিভার্সিটির জুলজি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান প্রফেসার ইল্লাইকোজুক মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছেন সঞ্জীবন যন্ত্রের চলন্ত কনভেয়ার বেল্টের উপর দাঁড় করানো তিন ইঞ্চি লম্বা কালো একটা পাঁঠার মূর্তির দিকে। অপর প্রান্তে পৌঁছেই তিন ফুট লম্বা তাজা এক জলজ্যান্ত পাঁঠা হয়ে গেল সেটা। দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো ভার।

'বা বা, বা!' খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন প্রফেসার।

'ব্যা, ব্যা, ব্যা!' ডেকে উঠল বতু পাঁঠা।

ঝট্ করে ফিরলেন প্রফেসার ইল্লাইকোজুক তাঁর প্রিয় ছাত্রী জেসিমারুলার দিকে। 'নকল করে কেন? ভ্যাঙাচ্ছে আমাকে! ইন্টেলিজেন্স আছে নাকি এটার আবার?'

'একেবারেই, নেই, স্যর,' বলল শ্রীমতি জেসিমারুলা। 'ওটা ডাকেই ওরকম করে।'

এবার ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা মহিষ দেখতে দেখতে বিশাল শিংওয়ালা এক ভয়ঙ্করদর্শন পূর্ণায়তন মহিষে পরিণত হলো, ফোঁস ফোঁস গরম নিঃশ্বাস ছেড়ে লাল চোখ মেলে চাইল প্রফেসারের দিকে।

'ওরেব্বাপ! এ দেখছি দৈত্য একটা!' আনন্দে পিঠ চাপড়ে দিলেন তিনি ছাত্রীর। 'দারুণ কালেকশন! আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর, জেসিমারুলা। কাজের কাজ করেছ তুমি। প্রত্যেকটার জোড়া আনতে ভোলনি তো?'

'দুজোড়া করে এনেছি, সার,' বলল জেসিমারুলা। 'এটা আর কী দেখেছেন, এর চেয়ে কয়েকগুণ বড়ও আছে একজোড়া। জাহাজ ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত দিইনি।'

'ভেরি গুড, ভেরি গুড! খুব ভাল। সবকিছুই শুভ ছিল, শুধু পৃথিবীর ওই মানুষটার সাথে যদি জড়িয়ে না পড়তে... ব্যাপারটা বড় বিশ্রী হয়ে গেল, তাই না?'

'আমারও খারাপ লাগছে, সার। ফিরে এসে জবাবদিহি করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে একেবারে।'

'সত্যিই সিদ্ধান্তটা ও তোমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল?'

'সত্যিই দিয়েছিল, সার।'

'ছি, ছি, ছি, ছি! এজন্যেই প্রত্যেকটা ফিল্ড ওয়ার্কারকে, বিশেষ করে মহিলা স্কলারকে বার বার করে বলে দিই আমরা, বুদ্ধি আছে এমন প্রাণী থেকে যেন দূরে সরে থাকে। কখন কি ঝামেলায় ফেলে দেবে আগে থেকে বুঝবার উপায় নেই। উদ্ভট ওদের নীতিবোধ! কী করে পারল আরেক জনের হাতে নিজের জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত তুলে দিতে? তক্ষুণি যদি এক কিলে ওকে ভর্তা করে দিতে, বা কোনও কথা না বলে বেরিয়ে চলে আসতে...'

'পারলাম না, সার।' মাথা নিচু করে বলল জেসিমারুলা। 'উপায় ছিল না আমার। ঋণী ছিলাম আমি ওর কাছে। অত্যন্ত ভদ্রলোক, দুর্বলতাও জন্মেছিল।'

'ছিঃ!' মুখ বিকৃত করলেন প্রফেসার। 'এক আধবার মনে হয়েছে আমার, লোকটা তোমার জীবন রক্ষা না করলেই হয়ত সবদিক থেকে ভাল হত। কিন্তু যা-ই হোক, যা হবার হয়েছে। যেভাবে জড়িয়ে পড়েছিল তাতে আর কিছু করবার উপায় ছিল না তোমার। যা করেছ, ঠিকই করেছ। তা, মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার এ প্রসঙ্গে?'

'হয়েছে, সার। এসেই যোগাযোগ করেছিলাম আমি তাঁদের সাথে।'

'কী বলল তারা?'

'যত দ্রুত সম্ভব এই ব্যাপারটা হাতে নেবেন বলে কথা দিয়েছেন। টিউমোরের সমস্যাটা খুব মারাত্মক কিছু বলে মনে করেন না তাঁরা। বললেন, বড়জোর সাতদিনের কাজ। কিন্তু তাঁদের হাত জোড়া আছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জটিল গবেষণার কাজে, সেগুলো শেষ না করে এই কাজে হাত দিতে পারছেন না। দুই থেকে তিন হাজার বছরের মধ্যেই আশা করা যায় এদিকে নজর দিতে পারবেন ওঁরা।'

'এত তাড়াতাড়ি!' অবাক হলেন প্রফেসার ইগ্নাইকোঞ্জুক। 'আমি শুনেছিলাম, আগামী পাঁচ হাজার বছর দম ফেলার ফুরসত নেই ওদের। তিন হাত লম্বা ওয়েটিং লিস্ট...'

'ঠিকই শুনেছেন, সার। তবে ওঁদের যখন বললাম এই ছেলেটা মেডিকেল

স্টুডেন্ট ছিল, তখন পুনর্বিবেচনা করেছেন ওঁরা।'

'ভাল। লোকটার কপাল ভাল বলতে হবে। এই চিকিৎসা এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণায় ব্যক্তিগতভাবে ও ছাড়া আর কেউ কোনও দিকে বা কোনও ভাবে উপকৃত হচ্ছে না···সেদিক থেকে দেখতে গেলে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে সে। যাই হোক, ইতিমধ্যে কি করছ তুমি ওকে নিয়ে?'

'কিছুই না।'

'জ্যান্ত করছ না?'

'না, স্যর।' ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আদরের সাথে ছয় ইঞ্চি লম্বা ইমরানকে বের করল জেসিমারুলা। সামান্য একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো ভঙ্গি মূর্তিটার। চোখে-মুখে অপার বিস্ময়ের ছাপ। 'ওকে দু'তিন হাজার বছর কষ্ট দেয়ার কোন মানেই হয় না। থাকুক এই রকম, ডাক্তারদের তারিখ পেলে জ্যান্ত করা যাবে।'

'ইচ্ছে করলে এই কয় বছরের জন্যে জাদুঘরকে ধার দিতে পার মূর্তিটা।'

'না, স্যর। একে নিজের কাছেই রাখব বলে স্থির করেছি। আমার জীবন বাঁচিয়েছিল ও। ওর প্রতি শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, কেমন একটা মমতাও জন্মে গেছে আমার। তাছাড়া···চমৎকার কাজে লাগানো যাবে ওকে পেপারওয়েট হিসেবে।'

ঝামেলা

কোথাও শান্তি নেই।

সারা বাংলাদেশে এত গোলাগুলি আরম্ভ হয়ে গেল যে বাধ্য হলাম দেশ ছাড়তে। মা প্রথমটায় রাজি হয়নি। বহুদিন নিশ্চিন্ত আরাম পেয়ে মন বসে গিয়েছিল এ দেশে। তাছাড়া ছোট বাচ্চা নিয়ে নড়াচড়া সোজা কথা নাকি? মা বলেছিল, এত ঝক্কি পোহাতে পারব না, বাপু। কিন্তু দাদু, মানে, আমার বাবার বাবা বলল, যেতেই হবে। এখন পাকিস্তানীরা গোলাগুলি করছে, এরপর বাঙালিরা গোলাগুলি শুরু করবে, দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে, কিন্তু গোলাগুলি আর ঝামেলা থামতে অনেক দেরি আছে। এখানে থাকা চলবে না আমাদের। উপায় নেই, দাদুর আদেশ অমান্য করা যায় না, উনিই বস্।

গোলাগুলির শব্দ মোটেই পছন্দ হয় না আমাদের। আমরা শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ, চাটগাঁর পাহাড়ি অঞ্চলে জঙ্গলের ভিতর নিরিবিলিতে বেশ কেটে যাচ্ছিল দিন, কোন গোলমালের মধ্যে নেই, ঝগড়া-ফ্যাসাদে নেই—দুড়ুম দাড়ুম, মড়মড় কড়কড় শব্দে হাঁপিয়ে উঠল জানটা। রওনা দিলাম।

দিলাম বললেই কি আর রওনা দেয়া যায়? প্রথমে আমাদের স্থির করতে হলো যাবটা কোথায়? এমন এক জায়গায় যাওয়া উচিত যেখানে বেশ কিছুদিন নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। অনেক ভেবেচিন্তে দাদু বলল, 'চলো, মানিকের ওখানে যাওয়া যাক।'

মানিক ছোঁড়া আমারই বয়সী। তিনটে পা ছিল ওর, আমরা ডাকতাম তেপায়া মাইনকা বলে। ছেলেবেলায় দৌড়ে পারতাম না ওর সঙ্গে। কিন্তু যতই বড় হতে থাকল ততই আলসে হয়ে গেল ও ক্রমে। কাজের ভয়ে পালিয়ে গেল একেবারে উত্তর আমেরিকায় কেন্টাকি অঞ্চলের এক পাহাড়ে। শুনেছি, দিন রাত পড়ে পড়ে ঘুমায় ওখানে।

বাঁধাছাঁধার যত কাজ সব পড়ল আমার ঘাড়ে। বাবা তো মদ খেয়ে বেহেড মাতাল, তাকে দিয়ে কোন কাজ করাবার প্রশ্নই ওঠে না—এক ভাঁড় ধেনো খেয়ে গান গাইছে আর ডিগবাজি খাচ্ছে সারা মাঠময়। ছোটচা'ও কোন কিচ্ছু করবে না। সে যাবেই না কিছুতে। সে বলল: 'আমার অসুবিধে নেই, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে কয়েকটা বছর ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেব, আওয়াজ খারাপ লাগে, তোমরা যাও, আমি নড়ছি না এই ধানের দেশ থেকে।' আসলে ধানেই খেয়েছে বাবা আর ছোটচা'—

এই দুই ভাইকে। দিনরাত চব্বিশঘণ্টা বুঁদ হয়ে আছে দু'ভাই ধেনো খেয়ে।

সারাদিন গেল আমাদের মালপত্র গুছিয়ে নিতে। বাচ্চাটাকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিল: যদিও ওর ওজন মাত্র সাড়ে তিন মন, ওর খাটিয়াটা ভারি আছে। যাই হোক, মালপত্রের সঙ্গে বাচ্চা পাঠাতে রাজি হলো না মা, খাটিয়ার জন্যে খানিকটা কষ্ট হবে বেচারীর, তা হোক, কোলের ছেলেকে মালপত্রের সঙ্গে জাহাজে পাঠাতে পারবে না মা কিছুতেই, সঙ্গে করে নিয়ে আকাশ-পথেই যাবে। ঠিক আছে, যো হুকুম। আমার কী, আমাকে যা হুকুম করবে, করব। তিনদিনের মধ্যে দাদুকে একটা বস্তায় পুরে মালপত্রের সঙ্গে তুলে দিলাম জাহাজে, আমরা রওনা হয়ে গেলাম আকাশ-পথে।

আগেই বলেছি··· ও-হো, বলিনি বুঝি? মানিক আসলে আমাদের পরিবারেরই ছেলে। খালাত ভাই হয়। কুঁড়ের হদ্দ। খালি ঘুমায় পড়ে পড়ে। ষাট বছর দেখা নেই ওর সাথে। দু'তিন বছর অন্তর অন্তর একটুখানি জেগে ওঠে, তখন ওর চিন্ত ভাবনাগুলো শোনা যায় কিছুক্ষণের জন্যে, তারপর আবার ঘুম। আমরা পৌঁছেও ওকে পেলাম ঘুমের মধ্যেই। ঘর তোলার কষ্টটুকুও করেনি ব্যাটা, পাহাড়ের ওপর একশো বছর আগের পরিত্যক্ত একটা ওয়াটার মিলে আশ্রয় নিয়েছে, ঘরদোরের একেবারে যা-তা অবস্থা। খোলা বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে সে, পায়া ভেঙে পড়ে গেছে নিচে, কিন্তু ঘুম থেকে উঠে কষ্ট করে আর মেরামত করেনি ওটা। দয়া করে যে অল্প-অল্প শ্বাস টানছে, তা-ই বেশি। চমৎকার স্বপ্ন দেখছিল ও একটা, কাজেই ওকে আর না জাগিয়ে আমি আর মা··· মানে, আমাকে দিয়ে মা বাসযোগ্য করে তুলল ঘরদোর।

খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থা দেখলাম না কোথাও। হাঁড়ি-কুড়ি-চুলোর ধার যে মানিক ধারবে না, সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলে একটা বাসন পর্যন্ত নেই—খায় কীসে করে? সামনের উঠনে শুধু একটা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি পড়ে আছে। একটু চিন্তা করেই বুঝতে পারলাম ওর কৌশল। খিদে পেলে সামান্য একটু জেগে উঠে পাহাড়ি জঙ্গলের কোথাও একটা কুন বা খরগোশকে হিপনোটাইজ করে সে। সম্মোহিত অবস্থায় পায়ে পায়ে চলে আসে সেটা তার কাছে। কুন বা খরগোশ ওর পছন্দ, তার কারণ সামনের পা দুটোকে ওরা অনেকটা হাতের মত ব্যবহার করতে পারে। আমার বিশ্বাস, আগুন জ্বালাবার খড়িও সে ওদের দিয়েই টানায়; বলা যায় না, যেমন আলসে লোক, রান্নাটাও হয়ত ওদের দিয়েই করায়। কিন্তু ছাল ছাড়ায় কিভাবে? নাকি সব সুদ্ধ রান্না হওয়ার পর খাওয়ার সময় পশমগুলোকে থুক দিয়ে ফেলে? ছিঃ, এত আলসেও হয় পানুষ! শুনেছি, পিপাসা পেলে নাকি মুখটা হাঁ করে খানিক বৃষ্টির ব্যবস্থা করে সে মাথার ওপর। লজ্জা!

পৌঁছেই এক ভাঁড় ধেনো নিয়ে বসে গেল বাবা ঘরের এককোণে। কাজেই যা কিছু করবার করতে হলো আমাকেই। কাজ খুব বেশি কিছু ছিল না, সমস্যা ছিল শুধু তড়িৎ হোক বা যাই হোক, যে কোন রকম একটা শক্তির। তা নইলে বাচ্চাটাকে বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ঝর্ণাটার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে এলাম—ওতে চলবে না। কুঁড়ের হদ্দ মানিক যে একটু কষ্ট করে আরও কয়েকটা

মুখ খুলে দিয়ে ঝর্ণাটাকে বড় করে নেবে তা না: ক্ষীণ একটা ধারা বইছে কেবল, ওটুকু ওর নিজেরই দরকার।

মা'র নির্দেশে উঠনে একটা খাম্বা খাড়া করলাম—ব্যস, আমাদের সবার জন্যে যতটা দরকার, তার চেয়েও তিনশো গুণ বেশি শক্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বেশ কাটছিল আমাদের সময়। দাদু পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে মালপত্রসহ। সংসার গুছিয়ে নিয়ে বসে গেছি আমরা, সব ঠিকঠাক, এমনি সময়ে উটকো এক ঝামেলা এসে হাজির হয়ে গেল। একদিন এক চিমড়ে মত লোক হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল উঠনে বসে মাকে বাসন মাজতে দেখে। একপা, দু'পা করে এগিয়ে এল সামনে। কাছেই একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁতন করছিলাম, আমিও একপা দু'পা করে লোকটার পেছনে এসে দাঁড়ালাম—বড়দের সব কথা শোনা চাই আমার, নইলে পেটের ভাত হজম হয় না।

'শহরের লোক মনে হচ্ছে?' বলল মা। 'খাবে নাকি এক গ্লাস ধেনো?'

ধেনো শব্দটার অর্থ ঠিক বুঝল না, কিন্তু গ্লাস ঠিকই বুঝল, চট করে রাজি হয়ে গেল লোকটা, সায় দিল ঘাড় কাত করে। আমি বাবার হাঁড়ি থেকে এক গ্লাস ঢেলে এনে দিলাম। দুই ঢোক খেয়েই ঠিকরে দুচোখ বেরিয়ে আসবার জোগাড় হলো লোকটার, খুক খুক কাশল, হাঁ করে হাঁপাল এক মিনিট, তারপর নামিয়ে রেখে দিল গ্লাস। জিজ্ঞেস করলাম আর খানিকটা দেব কিনা, ও বলল, সস্তায় এর চেয়ে অনেক ভাল বিষ পাওয়া যায়, বরং তাই খাবে। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে মায়ের দিকে ফিরল লোকটা।

'এই এলাকায় নতুন বুঝি?'

মা বলল হ্যাঁ, মানিক হচ্ছে তার বোন-পো, মানে, ছোট বোনের ছেলে, তার কাছেই এসেছে বেড়াতে, জায়গাটায় মন বসে গেলে থেকেই যাবে। ভাঙা চেয়ারের ওপর বেকায়দা ভঙ্গিতে চোখ বুজে পড়ে থাকা মানিকের দিকে চাইল লোকটা অবাক চোখে। 'লোকটা বেঁচে আছে?'

'নিশ্চয়!' বলল, মা। 'মরবে কেন? বালাই ষাট!'

'হায়, হায়!' বিচিত্র ভঙ্গি করল লোকটা চোখমুখের। 'বছরের পর বছর ওই রকম বসে থাকতে দেখে আমরা এতদিন মরা ভেবেছি ওকে। সেইজন্যেই পল-ট্যাক্স নেয়া হয়নি ওর কাছ থেকে। যাই হোক, তোমরা যখন এসে উঠেছ, তোমাদের ট্যাক্স দিয়ে ফেলো ঝটপট। কয়জন আছ তোমরা?'

'মোট ছয়জন,' বলল মা।

'সবাই পূর্ণবয়স্ক, নাকি বাচ্চাকাচ্চাও আছে?'

'মানিক, আমি, বাবা, আর অকর্মার ঢেঁকি ওর বাপ, ও—সিধু, আর বাচ্চা...'

'বয়স কত?'

'তা তিনশো তো হবেই, তাই না, মা?' বললাম আমি, কিন্তু খটাশ করে এক গাঁট্টা মারল মা আমার চাঁদি বরাবর, বারণ করল বড়দের কথার মধ্যে কথা বলতে। লোকটা আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল, বলল, ও জানতে চায় আমার বয়স কত। বিপদে পড়ল মা—অঙ্কের হিসেব একেবারেই মাথায় ঢোকে না তার, আমার দিকে চোখ পাকাল, 'বল্ না। মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন হাঁদার

মত?'

বলতে পারলাম না। আসলে আমারও মনে নেই। শের শাহের আমল থেকেই হিসেব রাখা ছেড়ে দিয়েছি আমি। ভেবেচিন্তে লোকটা বলল, বাচ্চাটা ছাড়া বাকি সবারই পল ট্যাক্স দিতে হবে।

'ওই যে নিচে শহর দেখছ, ওখানে গিয়ে ভোট দিয়ে আসতে হবে তোমাদের।' একটা খাতা বের করে সবার নাম লিখে নিল লোকটা। চোখ তুলে বলল, 'এই এলাকায় একজনই বস্। অ্যাংগাস মুলার। এবারও সে-ই জিতবে, কাজেই তাকেই ভোট দিতে হবে। পাইপারভিলের শাসন-ক্ষমতা আগামী বিশ বছরেও কেউ কেড়ে নিতে পারবে না তার কাছ থেকে। এবার বিশটা ডলার ছাড়ো দেখি!'

টাকা নিয়ে এসে দিতে বলল মা আমাকে। খোঁজ শুরু করলাম। দাদুকে টাকার কথা বলতেই পকেট থেকে একটা তামার পয়সা বের করে আমার চোখের সামনে ধরল, তারপর রেখে দিল যথাস্থানে। ওটা মোহাম্মদ বিন তোঘলোকের আমলের একটা মুদ্রা, দাদুর লাকি কয়েন—দিল না কিছুতেই। বাবার পকেট হাতড়ে দেখি ফক্কা। বাচ্চার নেকার বোকারের পকেট থেকে পাওয়া গেল তিনটে পাকিস্তানী একশো টাকার অচল নোট। আর ঘুমন্ত মানিকের পকেট থেকে বেরোল ছোট্ট একটা পাখির বাসা, তাতে সুন্দর দুটো সাদা রঙের ডিম।

খালি হাতে ফিরে এসে মাকে দেখালাম শূন্য হাত। মাথা চুলকাতে শুরু করল মা-বুদ্ধি খুঁজছে। আমি বললাম, 'কাল কিছু তৈরি করে দেয়া যেতে পারে, তাই না, মা? সোনা নেবে? সোনা হলে চলবে তো তোমাদের, মিস্টার?'

চাঁদির ওপর আরেকটা গাঁট্টা লাগাল মা। লোকটার চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহের ছায়া খেলে গেল। সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'কেন নেব না? সোনা না নেয়ার কি থাকতে পারে? একশোবার নেব। ঠিক আছে, চলি। কাল এই সময়ের দিকে আসছি আবার।'

কেমন একটা চতুর হাসি খেলে গেল লোকটার মুখে। ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হলো না আমার। জংলা পথ ধরে নেমে যাচ্ছে লোকটা। হঠাৎ দেখল সে, দুই হাতে এক বোঝা খড়ি নিয়ে হেলেদুলে একটা কুন চলেছে ওয়াটার মিলের দিকে। দ্রুততর হলো লোকটার চলার গতি। আমি বুঝলাম, খিদে পেয়েছে তেপায়া মাইনকার।

সোনা বানাবার জন্যে আশেপাশে কোন লোহার টুকরোটাকরা পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে লাগলাম আমি।

পরদিন ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দেয়া হলো আমাদের।

আমরা অবশ্য টের পেয়েছিলাম আগেই, কিন্তু করবার কিছুই ছিল না তেমন। দাদুর কথা হচ্ছে, কোন অবস্থাতেই যেন কারও চোখে পড়ে না যাই, আমাদের জন্যে সেটাই সবচেয়ে জরুরি। ঘাপটি মেরে থাকতে হবে আমাদের আরও কয়েক হাজার বছর। মীটিং হলো আমাদের নিজেদের মধ্যে। দাদু বলল, 'কোন ভয় নাই, নির্ভয়ে সবাই ঢুকে পড় গিয়ে জেলখানায়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তারচেয়ে পাওয়ারের ওই ঝাঘাটা লুকিয়ে ফেললে হয় না?'

আবার বড়দের কথার মধ্যে কথা বলার জন্যে মায়ের হাতের গাঁট্টা খেতে হলো আমার। মা বলল, 'কোনও কাজ হবে না তাতে। পাইপারভিল থেকে সাত-আটজন স্পাই এসেছিল আজ সকালে, নিজ চোখে দেখে গেছে ওরা ওটা।'

দাদু বলল, 'আমার আর বাচ্চার জন্যে বাড়ির নিচে সুড়ঙ্গ তৈরি হয়ে গেছে? ভেরি গুড। আমাদের দুজনকে ওখানে লুকিয়ে রেখে বাদবাকি তোমরা সবাই নিশ্চিন্তে চলে যাও জেলে। ভালা মুসিবতেই পড়া গেছে! আমাদের যদি খুঁজে বের করে ফেলে, সে বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে। সেদিন ওই লোকটাকে অত খাতির না করে ওর ভুঁড়িটা ফাঁসিয়ে দিলেই ঠিক হত।' আমাকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখে আমার ঘাড়ে হাত রেখে বলল, 'না রে সিধু পাগলা, ঠাট্টা করছিলাম। আমাদের প্রতি কারও মনোযোগ আকর্ষণ করা চলবে না এখন। তোরা চলে যা শহরে...ইতিমধ্যে ভেবেচিন্তে কিছু একটা বুদ্ধি বের করে ফেলব।'

দুপুর নাগাদ এসে গেল পুলিস। দাদু আর বাচ্চাকে খুঁজেই পেল না, বাদবাকি আমাদের সবাইকে হাঁকিয়ে নিয়ে তোলা হলো জিপে। মানিক ঘুম থেকে উঠল না কিছুতেই, ওকে ঠ্যাঙ ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে তোলা হলো। শহরের একটা তেরোতলা বাড়িতে ঢোকানো হলো আমাদের। বাড়িটার প্রথম তিনটে তলা সিটি হল, বাকি দশতলা জেল হাজত।

পাঁড় মাতাল অবস্থাতেই রইল বাবা। ইচ্ছে করলে যতক্ষণ খুশি নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার কৌশল জানা আছে তার। আমাকে একবার বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, ধেনো মদের অ্যালকোহল নাকি রক্তের সাথে মিশে কি এক অদ্ভুত উপায়ে চিনি হয়ে যায়। আমার মাথায় ঢোকেনি ব্যাপারটা কিছুতেই। কিছু খেলে সোজা যাবে সেটা, আমি জানি, পেটে। কীভাবে ওটা আবার মাথায় এসে চিনি হয়ে যাবে সেসব আমার বোঝার সাধ্যি নেই। আমার মনে হয় গুলপট্টি, তবে বলা যায় না, হতেও পারে। লেখাপড়া আমিও জানি না, আমার বাপও না—দু'জনেই আমরা গণ্ডমূর্খ, কিন্তু হাজার হোক বয়স হয়েছে, অনেক কিছু শিখে ফেলেছে নিজে থেকেই। বলছিল, এনজাইম বলে কাকে নাকি—নামটা শুনে তো মনে হয় বিদেশি কোন লোক—ট্রেনিং দিয়েছে এমনভাবে যে চিনিকে আবার অ্যালকোহল বানিয়ে নিতে কোন অসুবিধে নেই; ফলে, এক কলসী খেয়েই যতক্ষণ খুশি বুঁদ হয়ে থাকতে পারে সে নেশায়। তবে খাওয়ার স্বাদটা আর থাকে না। সেজন্যে নতুন ভাঁড়ই তার পছন্দ।

যাই হোক, আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা বড়সড় ঘরে। দেখি, ঘরভর্তি হরেক পদের লোক। একটা চেয়ারে বসতে বলল আমাকে, বসলাম। শুরু হলো জেরা। একেবারে হাঁদা গঙ্গারাম বনে গেলাম: যা জিজ্ঞেস করে আমার শুধু ভদ্দোরলোকের এক কথা—জানি না। কিছুই জানি না আমি।

'অসম্ভব!' হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'হতেই পারে না। এরা অশিক্ষিত, সাদামাটা, পাহাড়ি লোক, এদের দ্বারা ওটা তৈরি করা অসম্ভব। কিন্তু... কিন্তু ওদের উঠনে যে ইউরেনিয়াম পাইল রয়েছে, তাতেও তো কোন সন্দেহ

নেই।'

আবার শুরু হলো জেরা। কতভাবে যে পেটের কথা বের করবার চেষ্টা করল তার ইয়ত্তা নেই। একেবারে বোবা বনে গেলাম। কখনও গর্জন করল, কখনও কাকুতি মিনতি করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিল আমাকে একটা সেলে। বিছানায় শুয়েই চমকে উঠলাম। ছারপোকা! শয়ে শয়ে ছারপোকা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর চারপাশ থেকে। হ্যাৎ! লাফিয়ে উঠে চোখ দিয়ে এক রকমের আলো বের করে মেরে ফেললাম সব ক'টাকে। আমি কল্পনাও করতে পারিনি কেউ আবার লক্ষ করছে আমাকে, কাছেই কানের কাছে মানুষের গলা শুনে আঁৎকে উঠলাম একেবারে। পিছন ফিরে দেখি, ছানাবড়া চোখ করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে মোটাসোটা এক ক্লিনশেভড ভদ্রলোক। ওপরের বাংকে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল বলে লক্ষই করিনি আমি ওকে। ঝামেলা!

'বহুত জেলের বহুত সেল দেখেছি, বাবা,' খনখনে গলায় বলল লোকটা। 'জীবনের অর্ধেকটাই তো কাটালাম কোন না কোন জেলে।' দ্রুত চোখ মিটমিট করল। 'হরেক পদের কয়েদির সাথে রাত কাটাতে হয়েছে। কিন্তু এর আগে কোনদিন সাক্ষাৎ ভূতের সাথে একই জেলে বাস করবার সৌভাগ্য হয়নি। যাই হোক, তুমি যে-ই হও, বা যা-ই হও, গুড ইভনিং। আমার নাম গ্যাণ্ডি। লিউ গ্যাণ্ডি। ভবঘুরে সাংবাদিক, রাজনৈতিক কলাম লিখি। সত্যি কথা লিখি বলে বেশিদিন জেলের বাইরে থাকতে পারি না। এবার আমাকে ধরা হয়েছে ভ্যাগাবণ্ড হিসেবে। তোমার বিরুদ্ধে চার্জটা কি, ভায়া? ভয়টয় দেখিয়েছ নাকি মুলারকে?'

আহা, কথার কি চমৎকার বাঁধুনি। নিমেষে ভাল লেগে গেল আমার লোকটাকে। তাছাড়া শিক্ষিত লোক—শুধু পড়তে জানে তাই নয়, লিখতেও জানে। এর লেখা খবরের কাগজে বেরোয় আবার! তার মানে পণ্ডিত লোক! আর আমি? এই যেমন গড়গড় করে বলে যাচ্ছি, সেটা এক কথা; কিন্তু লেখা?—ওরেব্বাপ! ভক্তি এসে গেল আমার। নিজের নামটা বললাম ওকে, বললাম তার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হয়েছি। দাদুকে এইভাবে একজন মানুষের সাথে আলাপ শুরু করতে দেখেছিলাম একবার।

আমার বিরুদ্ধে কি চার্জ সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললাম, 'কেন যে ধরে এনেছে পরিষ্কার বুঝতে পারিনি আমি এখনও। শুধু আমি না, আমার বাপ, মা আর খালাত ভাইকেও ধরে আনা হয়েছে পাহাড় থেকে। মানিক তো ঘুমেই বেহুঁশ, আর বাবা বেহেড মাতাল।'

'আমিও মাতাল হলে ভাল হত,' বলল মিস্টার গ্যাণ্ডি। 'তা হলে তোমাকে মেঝে থেকে দু'ফুট উঁচুতে ভাসতে দেখে এতটা আশ্চর্য বোধ করতাম না।'

বিব্রত হয়ে পড়লাম আমি কথাটা শুনে। ওই ধরনের একটা কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়তে কারই বা ভাল লাগে? আসলে অসতর্ক ছিলাম আমি তখন, সেজন্যে বোকা বোকা লাগছে এখন। বললাম, 'আমি দুঃখিত।'

'আরে, না, না—দুঃখিত হওয়ার কি আছে?' অমায়িক কণ্ঠে বলল মিস্টার গ্যাণ্ডি। 'ভয় ডর বলে কিছু নেই আমার। বড়জোর মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে, এর

বেশি কি এমন ক্ষতি করতে পারবে মুলার আমার?' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাল। 'তোমাদের বিরুদ্ধে কোনও চার্জ আনা হয়নি?'

'হয়েছে,' বললাম। 'ওরা বলছে আমাদের উঠনে নাকি একটা ইউরেনিয়ামের খাম্বা আছে। একেবারে বাজে কথা, বাজি ধরে বলতে পারি আমি। একটা কাঠের থাম অবশ্য আছে, স্বীকার করি, কারণ আমি বলতে পারি, ইউরেনিয়াম বা হারমোনিয়াম কিছুই পুঁতিনি আমি।'

'পুঁতলে নিশ্চয়ই মনে থাকত তোমার,' বলল সদালাপী মিস্টার গ্যাণ্ডি। 'আমার মনে হয় ব্যাপারটা রাজনৈতিক। তোমাদের ওপর রাজনৈতিক চাল চালছে শালার পো শালা মুলার। ইলেকশনের এক হপ্তা বাকি আছে আর। বিরোধী দল বেশ জোরেশোরে ক্যাম্পেন শুরু করায় সেটাকে বানচাল করে দেয়ার এই মতলব এঁটেছে ব্যাটা।'

'আমাদের ছাড়বে কবে বলতে পারেন? বাড়ির জন্যে মনটা কেমন করছে।'

'থাক কোথায় তোমরা?'

কোথায় থাকি বললাম। শুনে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। পাহাড়ি ওই খালটার ধারে তো? ওই যাকে বিগ বেয়ার বলে, ওখানে না?'

'ওটা খাল কে বলল? পুরোপুরি একটা ঝর্ণাও তো না!' বললাম আমি।

শুনে হেসে খুন হয়ে গেল মিস্টার গ্যাণ্ডি। 'মুলার এটার নাম দিয়েছে বিগ বেয়ার রিভার। ড্যাম তৈরির আগে ওটার নাম হয়ে গেল রিভার। দেখনি বাঁধটা? তোমাদের ওখান থেকে মাইল খানেক দক্ষিণে, নিচের দিকে। গত পঞ্চাশ বছর ওই খালে পানির নাম নিশানা নেই। কত টাকা ঢেলে ড্যাম তৈরির অনুমতি বের করেছিল মুলার তা সে-ই জানে, দশ বছর আগে চিকন খালটাকে নদী নাম দিয়ে তৈরি করে বসল এক বাঁধ।'

'তাতে লাভটা কী?' অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

'তুমি নেহায়েত সাদামাটা ভাল মানুষ দেখছি, বাপু? টাকা···বুঝলে? একটা ড্যাম তৈরি করতে কত কোটি ডলার খরচ হয় তা জান?'

'তিন কুড়ি হবে?' ভয়ে ভয়ে বললাম।

'কুড়ি-ফুড়ি নয় হে, ভায়া, কোটি। একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, তারপর কোটি। দশ কোটি ডলার মঞ্জুর করিয়েছিল ও ওই ড্যামের জন্য—খরচ হয়েছে বড়জোর দু'কোটি, বাকি সবটা গেছে ওর পকেটে। যাই হোক, মুলারকে এবার হটানো যাবে না। দেশের নেতা যদি পত্রিকার মালিক হয়, তাকে সরানো মুখের কথা নয়। এই শোন···কে যেন আসছে আবার।'

দু'জন সেপাই এসে মিস্টার গ্যাণ্ডিকে ধরে নিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পর আরও দুইজন এসে আমাকেও ধরে নিয়ে গেল। এটা আরেকটা ঘর। খুব জোর আলো। ঢুকে দেখি, মিস্টার গ্যাণ্ডি বসে আছে কাঁচুমাচু মুখ করে। বাবা, মা, আর মানিককেও নিয়ে আসা হয়েছে। বন্দুক হাতে জনাকয়েক পালোয়ানের মত দেখতে লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজার দু'পাশে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে। ঘরের মাঝখানে বসে আছে শকুনের মত দেখতে এক গাল-তোবড়ানো টাকপড়া লোক। চোখের দিকে চাইলে মনে হয় বিষ ঝরছে ওখান থেকে। লোকটা যাকে যা হুকুম

করছে, কুত্তার মত দৌড়ে সেটা পালন করছে সবাই। এক মিনিটেই বুঝে নিলাম, এই লোকটাই অ্যাংগাস মুলার।

'এই বেচারী সাদামাটা পাহাড়ি তরুণ,' আমার দিকে চোখের ইঙ্গিতে দেখাল মিস্টার গ্যাণ্ডি, আমি ঘরে ঢুকতেই। 'কেন খামোকা ঝামেলায় ফেলছেন এদের, মিস্টার মুলার? এদের ছেড়ে দিন। এরা আপনার রাজনৈতিক শিকার হওয়ার উপযুক্ত নয়।'

অ্যাংগাস মুলারের ইঙ্গিতে খটাং করে এক ডাণ্ডা পড়ল মিস্টার গ্যাণ্ডির হাঁটুর ওপর, চুপ করে থাকতে বলা হলো, নইলে এরপর ডাণ্ডা পড়বে মাথায়। চুপ হয়ে গেল মিস্টার গ্যাণ্ডি। আমার ভয়ানক রাগ হলো, কিন্তু কিছু বললাম না। এবার সরাসরি আমার দিকে চাইল মুলার বিষ নজরে। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, লোকটা পাজি। এখন মুখের যে ভাব ভঙ্গি করছে সেটা সিনেমার ভিলেনদেরকেও হার মানায়। নিচু গলায় বলল, 'শোনো হে, ছোকরা। কোন কথা গোপন করে লাভ নেই। পার পাবে না। কাজেই স্বীকার করে ফেলাই ভাল। কাকে আড়াল দেয়ার চেষ্টা করছ তোমরা? বলে ফেল, কারা তৈরি করেছে ওই ইউরেনিয়াম পাইল তোমাদের উঠনে? সত্যি কথা বল, নইলে টর্চার করা হবে।'

বোবা দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। পেছন থেকে ডাণ্ডা মারল একজন আমার মাথায়। মনে মনে হাসলাম: মায়ের হাতের গাঁট্টা খেতে খেতে শক্ত হয়ে গেছে মাথাটা, ডাণ্ডাফাণ্ডায় কোন কাজ হবে না। আরেকটা বাড়ি পড়তেই চঞ্চল হয়ে উঠল মিস্টার গ্যাণ্ডি।

'দেখুন, মিস্টার মুলার,' বলল সে, 'আমি জানি, কে ওই ইউরেনিয়াম পাইল তৈরি করেছে সেকথা বের করতে পারলে আট কলাম হেডলাইন দিয়ে বিরাট এক ষড়যন্ত্রের গপ্পো ফাঁদতে পারবেন আপনি আপনার কাগজে। কিন্তু আমি বলি কী, এসবের কোন দরকার নেই আসলে, মশা মারতে কামান দাগছেন আপনি··· এমনিতেই পাওয়ারে আসতে পারবেন আপনি আবার। ওটা হয়ত ইউরেনিয়াম পাইলই নয়।'

চোখেমুখে জ্বলজ্বলে একটা ভাব ফুটে উঠল অ্যাংগাস মুলারের। বলল, 'আমি জানি কারা তৈরি করেছে ওটা। হয় পলাতক নাৎসী বৈজ্ঞানিক, নয়ত সোভিয়েট গুপ্তচর বিভাগ। আমার হাত থেকে নিস্তার নেই··· ধরবই আমি ওদের এবার!' পাগলাটে দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল মুলার—যেন খুঁজছে বৈজ্ঞানিক বা গুপ্তচর।

'বুঝেছি, বুঝেছি। এইবার বুঝতে পেরেছি!' বলল মিস্টার গ্যাণ্ডি। 'এবার ন্যাশনাল হিরো হওয়ার খায়েশ হয়েছে আপনার। গভর্নর বা সিনেটর না হতে পারলে আর মন ভরছে না। দেখুন মিস্টার মুলার, যদি এরা নির্দোষী হয়েও আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্টীমরোলারে চাপা পড়ে, আমার কলম কিন্তু মেশিনগান হয়ে যাবে, নেশনওয়াইড আন্দোলন শুরু করে দেব আমি আপনার বিরুদ্ধে বলে দিচ্ছি। মনে রাখবেন, সারা দেশের সব পত্রিকা আপনার হাতের মুঠোয় নেই। যদি মনে করে থাকেন···উ···হ্!'

ফটাশ করে একটা লাঠির বাড়ি পড়ল মিস্টার গ্যাণ্ডির কপালের এক পাশে।

একেবারে চুপ হয়ে গেল ভদ্রলোক।

কটমট করে চেয়ে রইল মুলার কিছুক্ষণ মিস্টার গ্যাণ্ডির ব্যথায় কোঁচকানো মুখের দিকে, তারপর যেন রসালাপ করছে এমনি ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'ওই ছোকরার সাথে কি আলাপ হয়েছে তোমার?'

কোন জবাব দিল না মিস্টার গ্যাণ্ডি। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ মুখ বাঁকিয়ে চেয়ে রইল মুলারের বিদ্রূপ কুটিল চেহারার দিকে।

এবার মানিককে ধরে পিটাতে শুরু করল ওরা। বিশ মিনিট এন্তার পিটিয়েও জাগানো গেল না ওকে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ক্ষান্ত দিল ওরা। কেবল ঘুমকাতুরে হলে এক কথা ছিল, কুঁড়ের বাদশা আমাদের মানিক—বেশি ঘুম পেলে মাঝে মাঝে শ্বাস নেয়ার কষ্টটুকুও স্বীকার করে না। মরে গেছে মনে করে ওকে ছেড়ে বাবাকে ধরল এবার সেপাইরা।

ভোম হয়ে রয়েছে আমার বাপজান। একেবারে টর্‌র্। একেকটা বাড়ি পড়ে, আর চেতনার গোড়ায় খানিকটা করে সুড়সুড়ির মত লাগে তার—খিক খিক করে বোকার মত হাসে। হ্যাৎ! ভীষণ লজ্জা লাগল আমার। বাবার এই ব্যবহারে বুঝতে পারলাম মা-ও লজ্জা পাচ্ছে। কারণ, পরিষ্কার শুনতে পেলাম, মা ভাবছে, 'মরণ! মিনসে কী একটা! যেন ভাঁড়!'

মাকে আর বেত মারার চেষ্টা করল না কেউ। বেত মারতে হলে কাছে তো আসতে হবে আগে। মার কাছে আসলেই রাজহাঁসের পালকের মত সাদা হয়ে যাচ্ছে ওদের শরীর, এক লাফে সরে গিয়ে দূরে দাঁড়াচ্ছে, কাঁপ উঠে যাচ্ছে সর্বাঙ্গে। এক প্রফেসর একবার বলেছিল, মা নাকি ইচ্ছে করলে সাবসোনিক টাইট-বীম এমিট করতে পারে। যত্তো সব গাঁজা! আসলে কেউ শুনতে পায় না, এই রকম একটা আওয়াজ করে মা, যেদিকে খুশি সেইদিকেই ছুঁড়তে পারে আওয়াজটাকে। বড় বড় গালভরা কথা বললে কী হবে, পানির মতন সহজ আসলে ব্যাপারটা। আমিও পারি।

পুরো দুটো ঘণ্টা আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অ্যাংগাস মুলার। সেলে পুরে দিতে বলল আমাদের। নাকের কাছে তর্জনী নাচিয়ে শাসাল, আমরা কতবড় হারামজাদা দেখে নেবে সে, আজকের রাতটা ক্ষান্ত দেয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু কাল থেকে নির্যাতনের নতুন কৌশল প্রয়োগ করা হবে—দেখা হবে কাল।

মানিককে পা ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল দুজন সেপাই, বাকি আমরা সবাই হেঁটেই ফিরলাম যার যার সেলে। মিস্টার গ্যাণ্ডির কপালে একটা জায়গা ফুলে গেছে হাঁসের ডিমের সমান। বাংকে শুয়ে ককাতে শুরু করল সে ব্যথার চোটে। আমি চুপচাপ আমার বিছানায় বসে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে চেয়ে রইলাম ওর কপালের দিকে। শুধু চাইনি, আমার চোখ থেকে একটা অদৃশ্য আলো পাঠালাম। আলোটা গিয়ে···দূর ছাই, অশিক্ষিত মানুষ, কেন কী হয় সেসব বোঝাবার সাধ্যি কি আমার আছে?—যাই হোক, মোটামুটি পুল্টিশের কাজ করে এই আলোর রশ্মি। দুই মিনিটের মধ্যেই হাঁসের ডিম দূর হয়ে গেল মিস্টার গ্যাণ্ডির কপাল থেকে, ককানি বন্ধ করে চোখ মেলল সে।

'সামনে কিন্তু মস্ত বিপদ তোমাদের, সিধু,' বলল সে চাপা গলায়। 'মুলার শালার মাথায় এখন মস্ত বড় বড় আইডিয়া খেলছে। এই ইস্তটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ন্যাশনাল ফিগার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে সে। ওর ঠ্যালা সামলানো মুশকিল হয়ে যাবে তোমাদের পক্ষে। আগে ভেবেছিলাম, আগামী ইলেকশনের জন্যে বুঝি এসব করছে ব্যাটা, এখন দেখছি, না, আরও কিছু আছে এর পিছনে। আচ্ছা, ওটা কি সত্যিই ইউরেনিয়াম পাইল?'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

'যাই হোক, মুলারের তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলেই চলল সে। 'কয়েকজন পদার্থ বিজ্ঞানীকে পাঠিয়ে পরীক্ষা করিয়েছে সে ওই পাইলটা। ওরা বলেছে, অত্যন্ত উঁচু মানের ইউরেনিয়াম পাইল ওটা—আমি নিজের কানে শুনেছি। এখন কাউকে বাঁচাবার চেষ্টা করা তোমাদের জন্য বোকামি হবে, সিধু। ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবে। কাল তোমার ওপর ট্রুথ সেরাম প্রয়োগ করবে ওরা···সোডিয়াম পেন্টাথল অথবা স্কোপোলামিন।'

'ঘুম এসে গেছে,' বললাম। 'আপনিও ঘুমিয়ে পড়ুন।' কারণ, মাথার মধ্যে টের পেলাম দাদু ডাকছে আমাকে, কথা বলতে চায়। শুয়ে পড়লাম চোখ বুজে, মনটা স্থির করলাম দাদুর কথা শুনবার জন্যে। কিন্তু বাবা মাঝখান থেকে ঝামেলা বাধাল, থেকে থেকে ক্রস কানেকশন করে ডিসটার্ব করছে। একেবারে বেসামাল অবস্থা তার।

'একটু খাবি, সিধে? খেয়ে দেখ এক ঢোক···দারুণ!' খুশিখুশি গলায় বলল বাবা।

'অ্যাইয়ো!' কষে এক ধমক মারল দাদু। 'অকর্মা, অপদার্থ, বেটপ মাতাল কোথাকার! ভাল চাস তো তোর ওই বজ্জাত মনটা নিয়ে পালা এখান থেকে···লাইন ছাড়। সিধু!'

'হ্যাঁ, বলো দাদু,' বললাম আমি মনে মনে।

'একটা প্ল্যান তৈরি করে নিতে···'

বাবা বলল, 'খা না একটু, সিধে। মাথায় ডাণ্ডা মারল, ব্যথা পাসনি তো, বাপ?'

'দেখো, বাবা, তুমি চুপ করবে? মুরুব্বিদের সামনে এত কথা কীসের?' গম্ভীরভাবে বললাম আমি।

'তুই আবার আমার মুরুব্বি হলি কবেরে, সিধে?'

'দাদু তোমার মুরুব্বি না?'

'একশোবার,' বলল বাবা। 'কিন্তু তুই তো আর না। আমি তো তোর সঙ্গে কথা বলছি। একটু চেখে দেখ, বাপ!'

'কেটে পড়ো, বাবা। বকবক করবার ইচ্ছে থাকলে ছোট-চা'র সাথে গল্প করোগে যাও। আমাদের একটু কাজের কথা বলতে দাও এখন।'

'একটু চেখে দেখ না!'

'কী করে?' এবার সরাসরি আক্রমণ করলাম আমি। 'বললেই তো আর হলো না! আমি কোথায়, আর তুমি রয়েছ কোথাকার কোন্ সেলে?'

'কায়দা আছে,' বলল বাবা। ট্র্যান্সফিউশনের মত ব্যাপারটা। টেলিপোর্টেশনও বলতে পারিস। তোর আর আমার মধ্যে যে স্পেস আছে সেটা শর্ট-সার্কিট করে তোর ব্লাডস্ট্রিমে অ্যালকোহল চালান করে দেয়া যায়। দেখবি কীভাবে?' এই বলে আমার মাথার মধ্যে একটা ছবির সাহায্যে পরিষ্কার দেখিয়ে দিল বাবা কায়দাটা। দেখলাম ব্যাপারটা আসলে সহজ। আমাদের পক্ষে তো একেবারে জল।

চটে গেলাম আমি। 'দেখো, বাবা,' বললাম, 'আপন ছেলের কাছে এভাবে নিজের মান নিজে খোয়ানো কি ঠিক হচ্ছে? লোকে তোমাকে ভাঙা চুলো, মরচে ধরা বুটপিন, আর মেথরের বেঁটে ঝাড়ুর সাথে তুলনা করবে যে! মানুষের ব্রেন থেকে বিদ্যে চুরি করে আমাকে তাক লাগাতে এসেছ তুমি!'

'খা না একটু, সিধে··· ওরেব্বাপ!' শেষটায় বিকট এক আর্তনাদ ছাড়ল বাবা। ফোকলা দাঁতে ফুকফুক করে হাসতে শুনলাম দাদুকে।

'বিদ্যে, চুরির বিদ্যে শিখেছ, অ্যাঁ?' টিটকারির ভঙ্গিতে বলল দাদু। 'আমারও জানা আছে ওই বিদ্যে। এক মিনিটে কয়েক কোটি মাইগ্রেন ভাইরাস তৈরি করে টেলিপোর্ট করে দিয়েছি তোমার ব্রেনে, হতভাগা, হাঁদারাম, চিকেন পক্স কোথাকার! তাড়িখোর, বদমাশ কোথাকার! এইবার শোন, সিধু। তোর বেয়াক্কেলে বাপ আর গোলমাল করবে না ঘণ্টা খানেক। শুনছিস?'

'হ্যাঁ, বলো দাদু। তোমরা সব ঠিক আছ তো?'

'আছি।'

'বাচ্চা?'

'সে-ও ঠিক আছে। কিন্তু তোকে এবার কাজে নামতে হবে রে, সিধু। গোলমালটা সত্যিই ওই···কি নাম যেন?··· ইউরেনিয়াম পাইলের ব্যাপারেই তো?'

'ওই ব্যাপারেই।'

'আশ্চর্য! ভাবতেই পারিনি যে এটা আবার ওরা চিনতে পারবে। আমার দাদা শিখিয়েছিল আমাকে ওটা তৈরি করবার কৌশল, আমি শিখিয়েছি তোদের। তার আমলে এ জিনিসের চল্ ছিল। যতদূর মনে পড়ছে এরই কারণে আমরা পানুষ হয়েছি। কিন্তু এখন তো যদ্দুর মনে পড়ায় চলবে না। পরিষ্কার ধারণা করতে হলে কারও ব্রেন থেকে সাহায্য নিতে হবে আমার। দাঁড়া দেখি, শহরে গোটা কয়েক ভাল ব্রেন আছে, ওদের কাছ থেকে কতটা জানা যায়।' আধ মিনিট ধরে গোটা কয়েক ব্রেন ঘেঁটে উত্তর পেয়ে গেল দাদু। বলল, 'শোন্, সিধু। আমার দাদার আমলে অ্যাটম ভাঙতে শুরু করে মানুষ। এর ফলে, ওকে কী বলে?—ও, হ্যাঁ, সেকেণ্ডারি র‍্যাডিয়েশন হয়। এই র‍্যাডিয়েশনে কিছু কিছু নারী-পুরুষের জিন্ আর ক্রোমোজমে আশ্চর্য এক পরিবর্তন দেখা দেয়। সেই পরিবর্তনের শিকার হচ্ছি আমরা। আমরা হচ্ছি পরমাণুর প্রভাবে পরিবর্তিত মানুষ—সংক্ষেপে, পানুষ। বুঝতে পারলি?'

'পারলাম।'

'কিন্তু কপালের ফেরে আমাদের আত্মগোপন করতে হলো।'

'কেন?'

'তখনও আমরা পুরোপুরি বুঝিনি আমাদের ভেতর কী প্রচণ্ড ক্ষমতা এসে গেছে এই পরিবর্তনের ফলে। নিজের ক্ষমতা প্রথমে পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি না করে তার প্রয়োগ করতে গেলে কী হয় তা তো নিজের চোখেই দেখেছিস···ধরে ধরে পুড়িয়ে মেরেছে মানুষেরা আমাদের সারা ইউরোপময়। উইচ হান্টিং বন্ধ হয়েছে, আজ আর সেই অবস্থা নেই, কিন্তু তবু সাবধান থাকতে হবে আমাদের আরও কয়েক হাজার বছর। যত দিন যাচ্ছে, ততই আবিষ্কার করছি আমরা নিজেদের মধ্যে নতুন নতুন বিস্ময়কর ক্ষমতা। যেদিন এই জানার শেষ হবে, যেদিন আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব আমাদের ক্ষমতা এবং অক্ষমতা, সেই দিন···সিধু, সেদিন আমরা কি করব সে তোর জানাই আছে।'

'হ্যাঁ, দাদু, মা বলেছে আমাকে।'

'সাবধানতার সুফল দেখতে পাচ্ছিস তো এখন? অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এই বিংশ শতাব্দীতে ওরা আবার শিখে ফেলেছে অ্যাটম ভাঙার কৌশল। সেইজন্যেই চিনতে পেরেছে ওরা এই ইউরেনিয়াম পাইল। এখন এটা নষ্ট করে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। মানুষের চোখে পড়া চলবে না কিছুতেই। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছেঃ পাওয়ার পাই কোথায়? কিছুটা পাওয়ার ছাড়া চলবে না আমাদের। ইউরেনিয়াম ছিল সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি, কিন্তু ওটা এখন ছাড়তেই হচ্ছে আমাদের। বিকল্প ব্যবস্থা করতে হলে একমাত্র পথ দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রিসিটি। কি করতে হবে বলছি, মন দিয়ে শোন্।'

সব শুনে নিয়ে কাজে লেগে গেলাম আমি।

চোখের দৃষ্টিটা বিশেষ একটা অ্যাংগেলে বাঁকা করলে অদ্ভুত সব জিনিস দেখতে পাই আমি। এই যেমন, জানালার লোহার গরাদের দিকে চাইলেই দেখতে পাই হাজার হাজার ছোট ছোট বিন্দু পাগলের মত ছুটোছুটি করছে, ঠিক সকাল দশটার ব্যস্ত রাজপথের গাড়ি-ঘোড়ার মত। যেন কত দরকারি কাজ পড়ে রয়েছে সবার, এমনি তড়িঘড়ি ভাব। এগুলোকেই বোধহয় অ্যাটম বলে। এদের দিকে চাইলে মনটা খুশি হয়ে ওঠে, এমনি মহা ফুর্তি ওদের চলাফেরায়। একটু জোরে তাকালেই আমার চোখ দিয়েও ওই রকম বিন্দু বেরিয়ে গিয়ে মেশে ওদের সঙ্গে—ইচ্ছে করলে খানিক কমবেশি করে যে কোন ধাতুতে পরিণত করতে পারি আমি যে কোন ধাতুকে।

নাক ডাকাচ্ছে মিস্টার গ্যাণ্ডি, মোটা শিকওয়ালা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তিন সেকেণ্ডের মধ্যে লোহাকে নরম সীসা বানিয়ে খসিয়ে ফেললাম দুটো গরাদ, তারপর বাইরে বেরিয়ে জায়গামত বসিয়ে লোহা করে দিলাম ওগুলো আবার। এগারো তলার ওপর থেকে নিচের রাস্তায় লোকগুলোকে পুতুল মনে হচ্ছে। অন্ধকার রাত বলে কেউ দেখে ফেলবার ভয় নেই, কাজেই নিশ্চিন্ত মনে ভেসে পড়লাম হাওয়ায়।

আগেই বলেছি, আকাশ-পথে চলতে আমাদের কোন অসুবিধে নেই।

প্রথমে ইউরেনিয়ামের সেই পাইলটার ব্যবস্থা করতে হবে, কাজেই তিনশো ফুট উপরে এসে থামলাম। জনা দশেক গার্ড পাহারা দিচ্ছে ওটাকে ঘিরে। সশস্ত্র, সতর্ক। আলো জ্বেলে নিয়েছে চারপাশে। কিন্তু আমাকে দেখতে পেল না কেউ।

ওপর থেকে প্রথমে গরম করে তুললাম আমি পাইলটাকে। ফলে গ্র্যাফাইটের অংশটা গায়েব হয়ে গেল বেমালুম, এবারে বাকিটুকুর দিকে মন দিলাম। সহজেই সীসা বানিয়ে ফেললাম জিনিসটাকে, তারপর এমন ভাবে এলোমেলো করে দিলাম ওর ভেতরের অ্যাটমগুলো যে কর্পূরের মত উবে গেল খাদটা তিন মিনিটের মধ্যে।

এবার উড়ে চলে গেলাম খালটার কাছে। তিরতির করে সামান্য একটু পানি বইছে খালটায়—ঝর্ণাও 'শেম শেম' বলবে, এতই কম। এতে চলবে না আমাদের, আরও পানি দরকার। পর্বতের ওপর দিকে অনেকদূর চলে গেলাম, কিন্তু কোথাও কোন সুবিধে দেখলাম না। ইতিমধ্যে দাদু আবার কথা বলতে শুরু করেছে মনে মনে। বাচ্চাটা কাঁদাকাটি শুরু করেছে। বুঝলাম, ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা না করে আগেভাগেই ইউরেনিয়াম পাইলটা নষ্ট করে দেয়া ঠিক হয়নি।

এখন একমাত্র উপায় বৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

একটা মেঘকে জমিয়ে প্রায় বরফ করে ফেললাম, নিচে নেমে এসে খালের ধারে একটা যন্ত্র তৈরি করলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওদিকে তাগাদা দিতে শুরু করেছে দাদু—কেঁদে খুন হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা। আবার উড়ে চলে গেলাম মেঘটার কাছে। ব্যবস্থা করতে সবমিলে আধঘণ্টা মত লাগল, কিন্তু তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোঁ সোঁ ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। তারপরই শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। কিন্তু ঝামেলা কি একটা? ঝমঝম বৃষ্টি নামল ঠিকই, কিন্তু খালের পানি যা ছিল তাই রইল। খানিক খোঁজাখুঁজি করতেই একটা জায়গায় এসে দেখলাম শুকনো খালের গায়ে, নিচের দিকে বেশ কয়েকটা বড়সড় গর্ত। গলগল করে পানি ঢুকছে ওই গর্তগুলো দিয়ে। জ্বালাতন! এতক্ষণে বোঝা গেল খাল শুকিয়ে যাওয়ার আসল কারণ। খালের নিচে সুড়ঙ্গ দিয়ে গড়গড়িয়ে চলে যাচ্ছে পানি। এরই জন্যে খাল শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। গর্তগুলো বুজে দিলাম গোটা কয়েক বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে।

কিন্তু এটা সাময়িক সমাধান। বার বার বৃষ্টি ঝরালে সন্দেহ হবে ওদের আবহাওয়া ডিপার্টমেন্টের—কাজেই অন্য ধরনের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা চাই। গন্ধ শুঁকে শুঁকে গোটা দশেক বড়সড় ঝর্ণা খুঁজে বের করলাম, ওগুলোর মুখ খুলে দিতেই জোরেশোরে পানি উঠতে শুরু করল নিচ থেকে।

এইবার ওয়াটার মিলের চরকাটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখলাম, ছোটখাট দু'একটা মেরামতের কাজ সেরে ফেললাম ঝটপট। পাঁইপাঁই ঘুরতে শুরু করল চাকা। চেয়ে দেখি, খাল কোথায়?—রীতিমত নদী হয়ে গেছে ওটা। নিশ্চিন্ত মনে গুহার ভেতর নেমে দাদুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম।

আদর করে আস্তে একটা গাঁট্টা মারল দাদু আমার মাথায়। গার্ডগুলো কোথায় গেল জিজ্ঞেস করায় হাসতে হাসতে বলল, দুই হাতে দুই কান চেপে ধরে যেদিক পেরেছে পালিয়েছে ওরা বাচ্চার সাইরেনের মত চিৎকারে।

দাদু আর বাচ্চার আরাম-আয়েসের সব ব্যবস্থা করে ফিরে চললাম আমি পাইপারভিলের দিকে। সকাল হয়ে আসছে, কাজেই ছুটলাম জেট ফাইটারের মত।

এই সাত সকালেই দেখলাম মহা হৈ-হুল্লুড় শুরু হয়ে গেছে পুরো তেরোতলা দালান ছুড়ে। সিটি হলে অনেক লোকের ভিড়। ছুটাছুটি করছে সবাই দিশেহারার মত। গায়েব হয়ে গেছে বাবা, মা আর মানিক। পৌঁছবার আগেই অবশ্য জানা হয়ে গেছে আমার ব্যাপারটা। মনে মনে কথা হয়েছে মার সঙ্গে। শেষ মাথার বড় সেলটায় চুপচাপ বসে আছে সব কজন—অদৃশ্য অবস্থায়। ইতিমধ্যে এত লোকজন দেখে আমিও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছি। আমার সেই এগারোতলার সেলের জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলাম বেঘোরে ঘুমাচ্ছে এখনও মিস্টার গ্যাণ্ডি। সোজা গিয়ে ঢুকলাম সবশেষের বড় সেলটায়।

'তোর দাদুর কাছ থেকে সব ঘটনা শুনেছি,' বলল মা। 'হ্যাঁরে, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে খুব?'

'খুব,' বললাম। 'কিন্তু এখানে এত হৈ-চৈ কীসের?'

'হঠাৎ আমরা কীভাবে কোথায় গেলাম বুঝে উঠতে পারছে না ওরা। গোলমাল একটু কমলে বেরিয়ে পড়ব সবাই, ফিরে যাব বাড়িতে। বাড়িঘরের যেখানে যা ছিল সব ঠিক আছে তো?'

'সব ঠিক আছে।'

হঠাৎ করিডরের ওমাথায় চেঁচামেচির শব্দ শোনা গেল। চোখ তুলে দেখি একটা মোটাসোটা খরগোশ দুপায়ে ভর দিয়ে হেঁটে আসছে এইদিকে, সামনের পা দুটোর সাহায্যে একবোঝা শুকনো চিকন ডাল বয়ে আনছে। সোজা এগিয়ে এসে আমাদের সেলের লোহার গেটের সামনে থামল ওটা, যত্নের সাথে লাকড়ি সাজাচ্ছে আগুন ধরাবে বলে। ভাবলেশহীন গম্ভীর চেহারা আর চোখের বিহ্বল দৃষ্টি দেখে বুঝলাম মানিক ব্যাটা হিপনোটাইজ করেছে ওটাকে। খিদে পেয়েছে মাইনকার।

লোকজন ভিড় করে দেখছে ওটার কারবার। আমরা সবই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু লোকগুলো আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। ওরা শুধু দেখছে খরগোশের কাণ্ড-কারখানা। আমিও উৎসাহের সাথে লক্ষ করছি ওটাকে। আগুন পর্যন্ত জ্বালাতে দেখেছি আমি একটা কুনকে, কিন্তু নিজের শরীরের ছাল ওরা নিজেরাই ছাড়ায় কিনা দেখবার সুযোগ হয়নি আমার কোনদিন।

আজও হলো না। লাকড়িগুলো সাজিয়ে নিয়ে আগুন জ্বালবার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা সেপাই এসে টপ করে তুলে নিল খরগোশটাকে, একটা থলের মধ্যে ভরে নিয়ে চলে গেল। হ্যাৎ! মজার একটা দৃশ্য ভণ্ডুল করে দিল ব্যাটা।

এদিকে মাঝে মাঝেই দূর থেকে প্রচণ্ড কলরব ভেসে আসছিল আমার কানে বেশ কিছুক্ষণ থেকে। লাল দীঘি ময়দানের মীটিঙের মত অনেকটা। সকাল হয়ে গেছে বেশ অনেকক্ষণ। বাড়ি ফেরার জন্যে উসখুস করছে মা। হঠাৎ একটা খনখনে গলার আওয়াজ আমার কানে গেল। মাকে বললাম, 'মা, মিস্টার গ্যাণ্ডির গলার আওয়াজ পেলাম মনে হচ্ছে। আমি বরং দেখি গিয়ে বেচারার কী দশা করছে ওরা। হয়ত সব দোষ ওর ঘাড়েই চাপাবার চেষ্টা করবে এখন অ্যাংগাস মুলার।'

'বেশি দেরি করিসনে, বাবা,' বলল মা। 'বাড়ি ফিরতে হবে। মনটা পড়ে

রয়েছে ওখানে। ওয়াটার হুইলটা ঠিকমত ঘুরছে তো?'

'ওসব তুমি কিচ্ছু ভেব না, মা। আমার কাজে ফাঁক পাবে না কোন। যা করব পাকা।'

'হয়েছে, হয়েছে, আর পাকামি করতে হবে না,' বলেই দুই হাতে দুটো গাঁট্টা চালাল মা—একটা আমার মাথায়, আরেকটা আমার বাপের। 'ওঠো! উঠে পড়ো, মিনসে। বাড়ি ফিরতে হবে এখন।'

'খা না একটু, বাপ!' বলেই চমকে উঠল বাবা আরেক গাঁট্টা খেয়ে। আরেক ধমক খেয়েই জেগে উঠল পুরোপুরি।

জানালাটা নরম করে দিলাম আমি, ঘুমন্ত মানিকের দুই হাত ধরল দু'জন দুপাশ থেকে, তারপর আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল জানালা গলে। অদৃশ্য অবস্থাতেই উড়তে হচ্ছে ওদের, কারণ নিচের রাস্তায় অনেক লোক জমে হৈ-হল্লা করছে। জানালাটা ঠিক করে দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি করিডোরে। মিস্টার গ্যাণ্ডির অবস্থা না দেখে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

কাল রাতের সেই ঘরটায় পাওয়া গেল ওদের। মিস্টার লিউ গ্যাণ্ডি বসে আছে একটা চেয়ারে, মার খেয়ে ফুলে গেছে চোখমুখ, বাম হাতের জামার আস্তিন গুটানো, একটা সিরিঞ্জ হাতে পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক—আদেশ পাওয়া মাত্রই ইঞ্জেকশন দেবে। চোখ বুজে মাথা নাড়ছে মিস্টার গ্যাণ্ডি। বলছে, 'সিধু কোথায় আমি জানি না, জানলেও বলতাম না তোমাদের!' জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে শকুনের মত দেখতে অ্যাংগাস মুলার, মাঝে মাঝে গলা বাড়িয়ে নিচের লোকদের দেখছে। ভুরু জোড়া কুঁচকে থাকায় আরও কুৎসিত লাগছে ওকে। মিস্টার গ্যাণ্ডির বিপদ দেখে মুহূর্তে নিজ মূর্তি ধারণ করলাম আমি। কিন্তু তার আগেই হুকুম দিয়ে দিয়েছে মুলার। ছুটে এগিয়ে গিয়ে এক থাবড়ায় মাটিতে ফেলে দিলাম আমি সিরিঞ্জটা সুঁচ ফুটাবার ঠিক আগের মুহূর্তে। নিচে কার্পেট থাকায় ভাঙল না সিরিঞ্জ। শুনলাম কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ধরো, ধরো··· এ ছোকরা পলাতক আসামীদের একজন!'

ধরে ফেলল আমাকে দু'জন দু'দিক থেকে। বাধা দিলাম না। চেপে ধরে একটা চেয়ারে বসানো হলো আমাকে, জামার আস্তিন গুটিয়ে তুলে দেয়া হলো ওপর দিকে, হিংস্র নেকড়ের মত কাছে এসে দাঁড়াল অ্যাংগাস মুলার, পিশাচের হাসি তার ঠোঁটে।

'আর কোন প্রশ্ন করার দরকার নেই,' বলল সে। 'আগে এক ডোজ ট্রুথ সিরাম ঝেড়ে দাও, ভুড়ভুড়িয়ে কথা বেরোবে আপনি।'

এখনও চোখ বুজেই রয়েছে মিস্টার গ্যাণ্ডি, ইতিমধ্যে কী ঘটে গেছে কিছুই টের পায়নি। কাতর কণ্ঠে বলল, ট্রুথ সিরাম দিয়ে কী আর মিথ্যে বলাতে পারবে আমাকে দিয়ে? সত্যিই জানি না আমি। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম···কিচ্ছু জানি না। জানলে কি আর বসে বসে আঙুল চুষতাম?—ওর সাথে আমিও···' খটাং করে কপালের ওপর একটা ডাণ্ডা পড়তেই দাড়ি-গোঁফ কামানো প্যাঁচার মত হয়ে গেল তার মুখের চেহারা। চুপ হয়ে গেল।

আমার নাকের কাছে নাক নিয়ে এল অ্যাংগাস মুলার। বলল, 'এর নাম ট্রুথ

সিরাম! বুঝেছ, বাছা? এর এক ডোজ পড়লে সত্যি কথাটা চেপে রাখতে পারবে না হাজার চেষ্টা করলেও। কয়েক মিনিটের মধ্যে জেনে নেব আমরা ইউরেনিয়াম পাইলের রহস্য। বুঝতে পেরেছ?' কথা তো নয়, যেন বিষ বোরোচ্ছে লোকটার মুখ দিয়ে।

পরিষ্কার বাংলায় বললাম, 'কুত্তার বাচ্চা!' কিন্তু বুঝল না কেউ।

পুচ করে সুঁই ঢুকিয়ে দিয়ে টিপে দিল একজন সিরিঞ্জের পেছনটা। জ্বলতে শুরু করল আমার শরীর। কেমন যেন চুলকানির মত অনুভূতি সারা শরীরে। শুরু হলো প্রশ্ন। প্রত্যেকটা প্রশ্নের একই উত্তর দিলাম, 'আমি জানি না।' আর এক ডোজ তরল পদার্থ ঢোকানো হলো আমার শরীরে। জ্বালা পোড়া বেড়ে গেল কয়েক গুণ।

ঠিক এমনি সময়ে দু'জন লোক দৌড়ে এসে ঢুকল ঘরে। ভয়ানক উত্তেজিত। একই সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল দু'জন—ফলে কারও কথাই বোঝা গেল না কিছু। একজনকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিল মুলার। দ্বিতীয় জনের এলোমেলো কথা থেকে বোঝা গেল, ভেঙে গেছে মুলার ড্যাম, দক্ষিণ উপত্যকার অর্ধেক খেত-খামার ডুবে গেছে বানের জলে।

'অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাংগাস মুলার। 'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার! বিগ বিয়ার নদীতে এককোঁটা পানি নেই আজ একশো বছর হলো!'

'একশো বছর পানি না থাকলে দশ বছর আগে ড্যাম তৈরি করা হলো কি আটকাবার জন্যে? হাওয়া?' জিজ্ঞেস করল মিস্টার গ্যাণ্ডি। বলেই মাথা নিচু করল। আশা করল, এই বুঝি লাঠির বাড়ি পড়বে মাথার উপর; কিন্তু কেউ কিছু বলল না তাকে। খবর শুনে পাথরের মত জমে গেছে সবাই।

আকস্মিক খবরের ধাক্কাটা মোটামুটি সামলে নিল মুলারই প্রথম। ঘরের এককোণে সরে গেল সে চার-পাঁচজন লোককে নিয়ে। ফিসফাস আলাপ করছে ওরা, স্যাম্পলের ব্যাপারে কি যেন কথা হলো, রাস্তায় জমে যাওয়া জনতার ব্যাপারে কথা হলো। একজন বলল, 'মব সামলাবে কে এখন আপনি ছাড়া?'

আরেকজন বলল, 'ফসল সব শেষ, জলদি যান, নইলে ইঁটপাটকেল ছুঁড়তে শুরু করবে লোকজন। গরম পানির মত ফুটছে সব।'

'ঠিক আছে, ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি আমি,' বলল মুলার। 'কারও হাতে কোন প্রমাণ নেই। আর ছয়দিন রয়েছে ইলেকশনের··· এর মধ্যে এ কী ঝামেলা শুরু হলো!'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। বাকি সবাই ছুটল পেছন পেছন। আমাদের অস্তিত্বই যেন ভুলে গেছে বেমালুম। উঠে দাঁড়িয়ে এখানে-ওখানে পাগলের মত চুলকালাম কিছুক্ষণ। কিন্তু চামড়ার ওপরে চুলকালে কি লাভ? —অসম্ভব চুলকানি হচ্ছে শরীরের ভিতরে, যেখানে চুলকানো যায় না। বড় রাগ হলো ব্যাটা অ্যাংগাস মুলারের ওপর।

'চলো হে, সিধু, এ-ই মওকা, এই ফাঁকে কেটে পড়ি,' বলল মিস্টার গ্যাণ্ডি।

পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। কেউ লক্ষই করল না। ঘুরে সামনে চলে এলাম। বৃষ্টিতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছে আর থেকে থেকে চিৎকার করছে পাঁচ-সাতশো লোক দালানের সদর দরজার দিকে মুখ করে। সিঁড়ির ওপর

মাইক হাতে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাংগাস মুলার। চোখেমুখে তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। তার সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল চেহারার এক লোক এক চাঁই পাথর নাচাচ্ছে।

'প্রত্যেকটা বাঁধেরই একটা ব্রেকিং পয়েন্ট আছে,' বলছে মুলার। 'ভাই সব, আপনারা জানেন...'

হাউমাউ করে উঠল প্রকাণ্ড লোকটা। 'যা-তা একটা কিছু বুঝিয়ে দিলেই হলো? আবোলতাবোল কথায় তো কোন কাজ হবে না, মিস্টার মুলার। আমি জানি কোন্ কংক্রিট ভাল, কোনটা খারাপ। এর মধ্যে এক ব্যাগ সিমেন্টের সাথে মেশানো হয়েছে অন্তত বিশ ব্যাগ বালু। এতদিন পানি ছিল না, অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এক গ্যালন পানি ঠেকাবার সাধ্যও তো নেই এই বাঁধের।'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল মুলার।

'তাই যদি হয়, সেটা তো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কথা!' বলল সে। 'এ ব্যাপারে আপনি যতটা হয়েছেন, ঠিক ততটাই মর্মাহত হয়েছি আমি নিজেও। সবল বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই কন্ট্র্যাক্ট দিয়েছিলাম আমরা। ডেল্টা কন্সট্রাকশন কোম্পানি যদি খারাপ মেটেরিয়াল ব্যবহার করে থাকে, আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব আমরা তাদের বিরুদ্ধে। বে-আইনী কিছু করে কারও পার পাবার উপায় নেই আমার হাত থেকে। আমি জানি, আমার দেশের মানুষ...'

এই পর্যায়ে এসে শরীরের ভেতরে চুলকানিটা এমন অসহ্য হয়ে উঠল যে একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে আর চলছিল না। কাজেই ওটার একটা বিহিত করে ফেললাম।

কথার তুবড়ির ঠেলায় বিশাল লোকটা এক পা পিছিয়ে গিয়ে আঙুল তুলল অ্যাংগাস মুলারের দিকে। 'শুনুন, জনদরদি নেতা! বাজারে গুজব রটেছে, যে আপনি নিজেই ডেল্টা কন্সট্রাকশন কোম্পানির মালিক। কথাটা কি সত্য?'

মুখ খুলল মুলার, চট করে বন্ধ করে ফেলল আবার। শিউরে উঠল একবার। তারপর আবার মুখ খুলল।

'সত্য,' বলল সে। 'হ্যাঁ, আমিই মালিক।' মুখ দেখে মনে হচ্ছে দারুণ অবাক হয়ে গেছে সে নিজের কথাতেই, যেন নিজের কথা নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না অ্যাংগাস মুলার।

কিন্তু জনতার উত্তেজিত সমবেত গর্জন চাটগাঁর পাহাড়ে ঘুমন্ত ছোটচা'কে পর্যন্ত জাগিয়ে দেবে বলে ভয় হলো আমার।

মুলারের উত্তর শুনে একটু ভড়কে গেল তার সামনে দাঁড়ানো লোকটা। হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখ। কিন্তু পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বলল, 'স্বীকার করছেন তা হলে? এটাও নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে বাজে মেটেরিয়াল দেয়া হয়েছে আপনার জ্ঞাতসারে, সম্পূর্ণভাবে আপনার নির্দেশেই?'

'আমার কোম্পানির সব কাজ আমার নির্দেশেই হয়,' বলল মুলার।

'কত কোটি ডলার লাভ করেছেন এই ড্যামের প্রজেক্ট থেকে?'

'দেড় কোটি খরচ হয়েছিল, আমার ছিল পাঁচ কোটি, দু'কোটি দিয়েছি পরিকল্পনা কমিশনকে, আর দেড় কোটি ঘুস দিয়েছি শেরিফ, ইঞ্জিনিয়ার, ইন্সপেক্টার আর...'

আর কী বলল শোনা গেল না, পাগলের মত চিৎকার করছে খেপে ওঠা জনতা, সিঁড়ি বেয়ে একেবারে মুলারের বুকের কাছে উঠে গেছে। হৈ-হট্টগোলে কারও কোনও কথা বোঝা যাচ্ছে না।

'বা, বা, বা, বা!' আনন্দে নেচে উঠল মিস্টার গ্যাণ্ডি। 'এ দৃশ্য জীবনে ভুলব না আমি, সিধু। মাথা খারাপ হয়ে গেছে লোকটার। কোনও সন্দেহ নেই তাতে। গেল ওর পার্টি নর্দমায় ভেসে। বিরোধী দল ক্ষমতায় আসবে এবার, হারামি অফিসারগুলোকে এক এক করে বেছে বের করবে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে আগামী পাঁচটা বছরের জন্যে নিশ্চিন্তে বাস করতে পারব আমি এই পাইপারভিল শহরে। বাহ্। জাদুমন্ত্রের মত উল্টে গেল যেন পাশার ছক। সিলিব্রেট করা দরকার, সিধু, চলো তোমাকে খাওয়াব আজ।'

'আজ না, আরেকদিন,' বললাম। 'মা চিন্তা করবে আমার জন্যে। আমি বরং চলি। আপনার আর কোন গোলমালে পড়ার আশঙ্কা নেই তো, মিস্টার গ্যাণ্ডি?'

'অদূর ভবিষ্যতে তো কোন সম্ভাবনা দেখছি না। ওই দেখো জেল হাজতে পুরে দিচ্ছে ওরা শয়তান মুলারকে। খুব সম্ভব ওর নিজের নিরাপত্তার জন্যেই। এই আনন্দ রাখি কোথায় বল তো, সিধু! সিধু! গেলে কোথায়, সিধু?'

ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছি আমি।

চুলকানি দূর হয়ে গেছে, কাজেই মনের সুখে উড়ে চলে এলাম আমি বাড়িতে। গোপন সুড়ঙ্গ পথে নিচে নেমে দেখি একটা ঘরে চেয়ারে বসে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে মানিক, খাওয়া দাওয়া শেষ। ওয়াটার হুইল থেকে ঠিকমত কারেন্ট তৈরি হচ্ছে কি না চেক করে খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিলাম আমি। বিকেল নাগাদ বানের জল কমে গেল, কিন্তু খালটা আগের মত আর শুকাল না, কারণ কাল রাতে কয়েকটা ঝর্ণার মুখ খুলে দিয়ে আমি নিয়মিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

আমরা নিরিবিলি জীবন পছন্দ করি। সেটাই আমাদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ। কাজেই সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে জমে বসলাম আমরা কেন্টাকি অঞ্চলে। চুপচাপ, নির্ঝঞ্ঝাট।

বন্যার গল্প শুনে দাদু বলল তার দাদু যখন বেঁচে ছিল সেই সময়ে মানুষ শুধু অ্যাটম বিচ্ছিন্ন করা নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত দিক দিয়েই এখনকার মানুষের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল; কিন্তু নিজেদের আয়ত্তে রাখতে পারল না ওরা কিছুই, ঘটিয়ে বসল অনর্থ। সেই সময় এক মহা বন্যা হয়েছিল। এমনই সে বন্যা, যে খুব দ্রুত দেশ ছেড়ে ভাগতে হয়েছিল তাকে ফ্যামিলি নিয়ে। বিরাট এক দেশ নাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল সে বন্যায়, ডুবে গিয়েছিল সাগরের নিচে। অনেকদিন আগের কথা, কোথায় যে ছিল সে দেশ সেকথা মনে নেই দাদুর, নামটা শুধু মনে আছে—অ্যাটলান্টিস।

বিচারে জেল হলো অ্যাংগাস মুলারের। কিছুতেই বোঝা গেল না হঠাৎ অমন করে সবকিছু স্বীকার করে বসল কেন লোকটা; কেউ বলছে ভয়ে, কেউ বলছে হঠাৎ বিবেকের আক্রমণে এই কাজ করেছে। তবে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কে জানে, আমার জন্যেই ব্যাপারটা ঘটল কিনা!

জেনে শুনে অবশ্য করিনি আমি কাজটা। মনে আছে?—বাবা যে আমাকে শিখিয়েছিল কি করে তার রক্তধারা থেকে আমার রক্তের মধ্যে অ্যালকোহল পাচার করা যায় স্পেস শর্টসার্কিট করে? ইঞ্জেকশনের ফলে চুলকানো যায় না, এমন জায়গায় রাম-চুলকানি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আমার। একেবারে যখন অসহ্য হয়ে উঠল, ওই বাজে ওষুধটা আমি পাচার করে দিয়েছিলাম অ্যাংগাস মুলারের রক্তে, ঠিক যে সময়টা জনতার সামনে মাইক হাতে বড় বড় কথা বলছিল, তখন। মুহূর্তে দূর হয়েছিল আমার চুলকানি, ভেবেছিলাম, এবার নিজের ওষুধে নিজে চুলকে মরুক শালা।

মাঝে মাঝে মনে হয়, বিবেক-টিবেক কিচ্ছু না, ওই চুলকানির জ্বালাতেই হয়ত সত্যি কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল পাজি লোকটার মুখ দিয়ে। কে জানে!

ওস্তাদ

আরিচা ঘাটে এসে ভিড়ল ফেরিবোট।

গ্যাঙওয়ে বেয়ে পিলপিল করে নেমে যাচ্ছে যাত্রীরা। যে-যার উঠে পড়বে বাসে, কোচে, ট্যাক্সিতে—রওনা হয়ে যাবে ঢাকার পথে। তাই শেষবারের মত সবার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছেন আব্বাস মির্জা। সবাই নেমে যেতে ডেকের উপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক আর প্রাইভেট-কারগুলোর ড্রাইভারদের উপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পা বাড়ালেন তিনি ঘাটের দিকে। নাহ্, অন্তত এই ট্রিপে যে সে নেই সে-ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। নগরবাড়ি থেকে আরিচা ঘাট, এত লম্বা পথ একই ফেরিতে তাঁর চোখ ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপন করে থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। রুস্তম শেখ কেন, স্বয়ং সাইমন টেম্পলারের পক্ষেও না।

ছিপছিপে, লম্বা একহারা চেহারা আব্বাস মির্জার। ইস্তিরিহীন সাদামাটা সুট, হাতের প্লাস্টিক মোড়া সস্তা ব্রিফকেস আর পায়ের বার দশেক হাফসোল করা নাকথ্যাবড়া, পুরানো জুতো দেখে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করতে পারবে না কেউ তাঁকে; ধরে নেবে, ওষুধ, বই বা ওই রকম প্রস্তুতকারী কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্যানভাসার। তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখজোড়া ছাড়া মুখ দেখেও বুঝবার উপায় নেই কিছু। গায়ের রঙ শ্যামলা। সবকিছুই অতি সাধারণ, নিতান্তই সাদামাটা। অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে কেউ বুঝবে না, কোটের নিচে ভদ্রলোকের বগলের কাছে বিরাজ করছে একটা লোডেড রিভলভার পোরা শোলডার হোলস্টার, বুক পকেটে রয়েছে যে-কোন দুষ্কৃতকারীর পিলে চমকে দেয়ার মত একটা আইডেন্টিটি কার্ড, আর ঘন কালো, কোঁকড়া, ব্যাকব্রাশ করা চুল দিয়ে ঢাকা রয়েছে এ যুগের অত্যাশ্চর্য ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। যদিও উজ্জ্বল চোখজোড়া এখন ঢাকা রয়েছে হাল্কানীল সানগ্লাসের আড়ালে, তবু বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয় বর্ণনা শুনেই চিনে ফেলেছেন এই সাদামাটা ভদ্রলোকটিকে? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। ইনিই সেই স্বনামধন্য প্রতিভাবান সত্যান্বেষী গোয়েন্দা আব্বাস মির্জা—ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের চীফ ইন্সপেক্টার, বাঘা মির্জা।

রুস্তম শেখকে পাবনা শহরে দেখা গেছে জানতে পেরে ছুটেছিলেন তিনি সেখানে, কিন্তু দুদিন পরেই ঢাকা থেকে সংবাদ পেলেন, ঢাকায় দেখা গেছে ওকে। আবার ফিরে চলেছেন এখন ঢাকায়। গত দেড়টি বছর ধরে বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছে তাঁকে এই আশ্চর্য কৌশলী দস্যু। দুই-দুইবার ওঁর আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে লোকটা, বোকা বানিয়ে কাঁচকলা দেখিয়েছে, তারপর যা খুশি করে

বেড়িয়েছে সারা দেশময়। এবার আবার কার যে কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। দুরভিসন্ধি কিছু একটা আছে, কিন্তু কী সেটা? ঢাকায় আলখেল্লা পরা মৌলভীর ছদ্মবেশে তাকে দেখা গেছে শুনে একেবারে খেই হারিয়ে ফেলেছেন আব্বাস মির্জা। তিনদিন আগে তাকে দেখা গেছে পাবনা মেন্টাল হসপিটালে একজন বিদেশী ভিজিটিং ডাক্তারের ছদ্মবেশে, আজ মৌলভীর। ব্যাপার কী? আগের থেকে এর মতলব আঁচ করবার কি কোনই উপায় নেই? যা খুশি তা-ই করে বেড়াবে লোকটা, আর সেটা চুপচাপ হজম করতে হবে তাঁকে? দশ মাসের ট্রেনিঙে গিয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে, সেখানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রাখর্য দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি সবাইকে—আর দেশে ফিরে এসে হেরে যাবেন সাধারণ এক দুষ্কৃতকারী দস্যুর কাছে? অসম্ভব! জেদ চেপে গেছে আব্বাস মির্জার। যেমন করে হোক গ্রেপ্তার করতেই হবে ওকে।

এমন পাজি আর ধূর্ত লোকের পাল্লায় এর আগে পড়েননি তিনি কোনদিন, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন বাঘা মির্জা। কয়েকদিন পরপরই ওর সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সব খবর বেরোচ্ছে দৈনিক পত্রিকায়, ফিচার লেখা হচ্ছে সাপ্তাহিকে, পুলিসের অক্ষমতা আর অকর্মণ্যতা সম্পর্কে কটাক্ষ করে উষ্মা প্রকাশ করা হচ্ছে। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না কেউ। একের পর এক শয়তানি করে চলেছে লোকটা নির্বিঘ্নে, পুলিস-গোয়েন্দার নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হাসতে হাসতে। একের পর এক তেলেসমাতি কাণ্ড করে চলেছে রুস্তম শেখ, হাস্যাস্পদ করে ছেড়ে দিচ্ছে পুলিস আর গোয়েন্দা বিভাগকে। বসে বসে আঙুল চোষা আর তামাশা দেখা ছাড়া করবার তেমন কিছু নেই কারও—এতই নিপুণ ভাবে সারছে সে প্রতিটা কাজ। নানা ধরনের গল্প ছড়াতে শুরু করেছে তাকে নিয়ে। সত্য-মিথ্যা নানান রকম। কেবল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পর্কেই নয়, তার আসুরিক দৈহিক শক্তি সম্পর্কেও, তার উদ্ভট সব রসিকতা সম্পর্কেও। কবে সেপুলিসের কোন্ বড়কর্তাকে মাথা নিচু পা উঁচু করে বেঁধে দিয়েছিল গাছের ডালে, কবে দুই পুলিসকে দুই বগলে চেপে ধরে রেলগেট থেকে রথখোলার মোড় পর্যন্ত দৌড়ে গিয়েছিল সে জনাকীর্ণ নবাবপুর সড়ক দিয়ে, ইত্যাদি অনেক গল্প চালু হয়ে গেছে লোকের মুখে মুখে। সরাসরি ডাকাতি-ছিনতাই তো আছেই, কয়েক রকমের 'হায় হায়' কোম্পানি খুলে হোলসেল ঠগবাজি করেছে সে, সর্বস্বান্ত করেছে হাজার হাজার লোককে। একবার বিনা দুধে, বিনা গরুতে ছয়মাস চালিয়েছিল সে একটা ডেইরি ফার্ম—সাড়ে চার হাজার গ্রাহকের কাছ থেকে পুরো মাসের টাকা নিয়ে সটকে পড়েছিল। একরাতে ধানমণ্ডির গোটা তেরো নম্বর রোডের প্রত্যেকটা বাড়ির নাম্বার পাল্টে দিয়েছিল সে একজন বিদেশী কোটিপতি শিকারকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে—সোজা গিয়ে তার পাতা জালে ধরা পড়েছিল বেচারি। নিত্যনতুন পদ্ধতিতে সবার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে রুস্তম শেখ।

ছদ্মবেশ ধারণেও অসাধারণ পটু লোকটা। তবে একটা মস্ত দুর্বলতা রয়েছে ওর—ঝাড়া ছ'ফুট দৈর্ঘ্য তার, গোপন করবার উপায় নেই। শত চেষ্টাতেও নিজের উচ্চতা ঢাকতে পারবে না সে। এটাই আব্বাস মির্জার একমাত্র ভরসা। 'ছ'ফুট

লম্বা লোক বাংলাদেশে টাকায় ষোলোটা মেলে না। কাজেই কোথায় যাবে? ধরা ওকে পড়তেই হবে; আজ হোক বা কাল।

খবর যদি সত্য হয়, রুস্তম শেখ এখন ঢাকায়। তবু বলা যায় না আসলে সে কোথায়। ওর সম্পর্কে কখনও নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। এমনও হতে পারত, হয়ত ওঁরই সাথে একই ফেরিবোটে করে সে-ও চলেছে ঢাকায়। প্রত্যেকটা যাত্রীকে নেমে যেতে দেখে সে-সন্দেহ অবশ্য নেই আর। বিড়ালের ছদ্মবেশে ঘোড়া যেমন পার পেতে পারে না, তেমনি যাত্রীর ভিড়ে মিশে পার হয়ে যাওয়া রুস্তম শেখের পক্ষে অসম্ভব। মোটামুটি লম্বা কোন বোরখা পরা মহিলা হলেও হয়ত সন্দেহের অবকাশ থাকত, কিন্তু পৌনে ছয়ফুটের উপর নারী বা পুরুষ কাউকে দেখা যায়নি ফেরিবোটে।

বাসে উঠেও চারপাশে চোখ বুলালেন আব্বাস মির্জা। নানান ধরনের লোক উঠেছে: ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শ্যামলা-কালো, ভদ্র-অভদ্র, হিন্দু-মুসলমান, দাড়ি-গোঁফ, আলখেল্লা···হ্যাঁ, আলখেল্লা পরা সেই মৌলানাও উঠেছেন এই বাসেই। আধহাত লম্বা, শতকরা পঁচানব্বই ভাগ পাকা দাড়ি, সৌম্য চেহারার এক মৌলভী চলেছেন ঢাকার পথে—সেই পাবনা থেকেই। মৌলভী দেখেই চট করে আব্বাস মির্জার মনে পড়ে গিয়েছিল রুস্তম শেখের কথা—ঢাকায় মৌলভীর ছদ্মবেশে দেখা গেছে ওকে! কিন্তু পরমুহূর্তে হাসি এসে যাচ্ছিল তাঁর। লম্বায় এই মৌলভী বড়জোর পাঁচ ফুট। নূরাণী, সুখী চেহারা। নিষ্পাপ, ভাসাভাসা দুই চোখ, হাসিতে শিশুর সারল্য। জামা-কাপড়ে অসংখ্য ভাঁজ, আধময়লা, কাঁধে ঝোলা, বগলের নিচে গোটা দুই সীলমোহর করা খয়েরী কাগজের প্যাকেট। ছাতাটা দেখবার মত। খুব সম্ভব পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া ছাতাটার মায়া কাটাতে না পেরেই তালির পর তালি দিয়ে চলেছেন মৌলভী সাহেব, আসল কাপড় আর এক চিলতেও নেই। বোঝা যায়, অত্যন্ত ভুলো মনের লোক। নগরবাড়ি ঘাটে বাস থামতেই ছাতা সামলাবেন, না ঝোলা সামলাবেন, নাকি হাতের প্যাকেট: কোন্‌টা কীভাবে সামলাবেন তাই নিয়ে দিশে হারিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। থলে কাঁধে ঝুলাতে গেলে ছাতা পড়ে যায়, প্যাকেট তুলতে গেলে ঝোলা পড়ে যেতে চায় কাঁধ থেকে, টিকেট কোথায় তাই খুঁজতে বেসামাল অবস্থা। দেখে রীতিমত করুণারই উদ্রেক হয়েছিল আব্বাস মির্জার। সাধারণ ভাবে ধর্মান্ধ, গোঁড়া কাঠমোল্লাদের ব্যাপারে উন্নাসিক একটা বিরূপ মনোভাব রয়েছে আধুনিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত তীক্ষ্ণধী ইন্সপেক্টারের, কিন্তু গোবেচারা এই ভুলো মানুষটার ব্যাপারে একটা অকৃত্রিম করুণাবোধ বিব্রত করেছে তাঁকে। ফেরিতে উঠে নেহাত ভদ্রতাবশেই জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি, 'কোথায় চলেছেন?'

কথা বলার সুযোগ পেয়ে একেবারে বিগলিত হয়ে গেলেন সরল মৌলভী। একগাল হেসে বললেন, 'ওরসে চইল্লাম। পবিত্র ওরস শরীফ, জ্বে।'

'ঢাকায়?'

'না, না। শাহান শাহে তারিকাৎ হযরত মাওলানা খাজা শাহ্ সুফী মোহাম্মদ আক্কাস আলী বিক্রমপুরী নকশবন্দী মোজাদ্দেদী (করম্ উল্লাহ আলায়হে, অর্থাৎ, আল্লাহ্ ইঁহার প্রতি দয়া বর্ষণ করুন) সাহেবের পবিত্র ওরস শরীফ। কুমিল্লার

শামসনগরে। প্রত্যেক বসরই হয়। আমাদের কেবলাজান জিন্দাপীর হযরত শাহ্ সূফী শামসনগরী নকশবন্দী মোজাদ্দেদী (রাজিআল্লাহু আলায়হে, অর্থাৎ আল্লাহ্ ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হউন) এর পবিত্র দরবার শরীফে বিরাট ওরস। সবার জন্যেই দিলখোলা দাওয়াত—আপনিও আসতে পারেন, জ্বে। শহর হইতে মাত্র সাত মাইল দূর। এই পবিত্র ওরস শরীফে বিশ্বের দরদী, দয়ার নবী রসুলপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের রুহ পাকের হুজুরে, তামাম দুনিয়ার ওলীআল্লাহ্ আর সমস্ত মোমেন মুসলমানের আরওয়াহ্ পাকের উপর সোয়াব রেসানী করা হইবে। আমরা যারা খাদেম…'

কথার তুবড়ি সহ্য করতে না পেরে তড়িঘড়ি সরে পড়বার চেষ্টা করছিলেন আব্বাস মির্জা, পাশ ফিরে পলায়নের জায়গাও খুঁজছিলেন, এমনি সময়ে যাত্রীদের একজনের একটা প্রশ্নে কান খাড়া করলেন।

'মনুই সাপের ওই ফ্যাকোটের বিথরে কী?'

'কোন্‌টা…এইগুলি? ও। এর একটায় ভিতরে আছে পবিত্র আবে জমজমের বোতল, আর একটায় আছে টাকা।' সরল মৌলভী চারপাশে চাইলেন সতর্ক দৃষ্টিতে। গলাটা একধাপ নামিয়ে, কিন্তু আশপাশে বিশ পঁচিশজনের শোনার পক্ষে যথেষ্ট জোরে বললেন, 'অনেক টাকা। ত্রিশ হাজার, জ্বে! ওরসের জইন্য চাঁদা তোলা হয়েছে পীর-ভাইদের কাছ থেকে। খুব সাবধান…বুঝলেন?—সবাই বলে দিয়েছে আমাকে, খু-উ-ব সাবধানে থাকতে হবে আমাকে…খোয়া গেলেই গেল!'

বেঁটে খাটো এই গ্রাম্য মৌলভীকে আর একটু ভালভাবে লক্ষ করবার জন্যে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিলেন বাঘা মির্জা। মৌলানা সাহেব তখন চাপা গলায় কার কাছ থেকে কত টাকা পাওয়া গেছে সবিস্তারে জানাচ্ছিলেন সহযাত্রীদের। বেশ অনেকক্ষণ লক্ষ করবার পর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করলেন আব্বাস মির্জা, মনে মনে স্থির করলেন, সুযোগ পেলেই সাবধান করতে হবে এই সরল বৃদ্ধকে—নইলে দরবার শরীফে পৌছতে পৌছতে টাকার বাণ্ডিল যে গায়েব হয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু ঢাকাগামী বাসে উঠে আরও ভয়ঙ্কর কাজ করে বসলেন আপনভোলা মৌলভী। ঝোলা আর প্যাকেটগুলো সিটের উপর নামিয়ে রেখে পাশের দু'একজনকে সেগুলো দেখতে বলেই ফেরিবোটে ফেলে আসা ছাতা খুঁজতে ছুটলেন তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে। তিন মিনিট পর হাসতে হাসতে ফিরে এলেন ছাতা উদ্ধার করে নিয়ে, সময় থাকতে যে মনে পড়েছে তাতেই যার-পর-নাই খুশি।

ঢাকায় পৌছে ফার্মগেটের কাছে নেমে পড়লেন মৌলভী লটবহর নিয়ে, বাস ছেড়ে দেয়ার পর সবাই লক্ষ করল, ঝোলা থেকে কখন একটা ছোট পুঁটুলি পড়ে গেছে খেয়ালই করেননি তিনি, অদৃশ্য হয়ে গেছেন জনসমুদ্রে। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছে, নাখাল পাড়ায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাসায় রাত কাটিয়ে কাল সকালে কমলাপুর থেকে বাসে রওনা হবেন মৌলভী সাহেব কুমিল্লার পথে। এখন কী কর্তব্য তাই নিয়ে সহযাত্রীরা যখন হিমশিম খাচ্ছে, তখন হাত বাড়িয়ে পুঁটুলিটা তুলে নিলেন আব্বাস মির্জা, সবাইকে আশ্বাস দিলেন কাল সকালে ওটা বাসস্ট্যাণ্ডে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। তাঁর সত্যিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাদের

চোখে সন্দেহের আভাস ফুটে উঠতে দেখলেন তাদের নাকের কাছে আইডেন্টিটি কার্ডটা ধরলেন তিনি কয়েক সেকেণ্ড করে। ইশারাই কাফি। কার্ডের উপর একবার নজর বুলিয়েই মুহূর্তে দূর হয়ে গেল তাদের সব সন্দেহ, তার বদলে ফুটে উঠল একটা সমীহর ভাব। কে না শুনেছে গোয়েন্দা আব্বাস মির্জার নাম? তাঁকে স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হওয়ায় ধন্য মনে করল তারা নিজেদের।

মালিবাগের মোড়ে নেমে পড়লেন বাঘা মির্জা, সোজা গিয়ে ঢুকলেন অফিসে, হাতের কাজ শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে এগারোটা। সারাদিনের ধকল শেষে সেঁটে ঘুম দিয়ে উঠলেন পরদিন বেলা সোয়া ন'টায়। উঠেই মনে পড়ে গেল গতকালকের সেই পুঁটলির কথা, মুখ-হাত ধুয়েই ত্রস্তহাতে জামাকাপড় পরলেন তিনি, ছুট দিলেন কমলাপুর বাস স্টেশনের দিকে। মনে মনে পরিষ্কার জানেন, এত বেলায় পাওয়া যাবে না মৌলভী সাহেবকে, তবু দায়িত্ব নিয়ে তা পালন করতে না পারার লজ্জায় তাড়া দিলেন তিনি বেবিট্যাক্সি চালককে আরও জোরে চালাবার জন্যে।

পৌঁছে জানা গেল দুটো বাস ছেড়ে গেছে ইতিমধ্যেই, তৃতীয়টা ছাড়ি ছাড়ি করছে। আশপাশে কোথাও মৌলভীর চিহ্নমাত্র নেই। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে চারপাশে চাইলেন আব্বাস মির্জা, রাস্তার পাশে একটা ঝলমলে রেস্তোরাঁ চোখে পড়তেই পেটের ভিতর হাঁউ-মাউঁ-খাঁউ করে উঠল খিদে। সোজা গিয়ে ঢুকলেন তিনি রেস্তোরাঁয়। বাস স্ট্যাণ্ডটা পরিষ্কার দেখা যায় এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসলেন সেদিকে ফিরে। নাস্তার অর্ডার দিয়ে চোখ বুলালেন খবরের কাগজে। রুস্তম শেখের নতুন কোন খবর নেই দেখে যার-পর-নাই স্বস্তি বোধ করলেন। বেয়ারা পরোটা, ডিম আর মিষ্টির প্লেট নামিয়ে দিল টেবিলের উপর, চায়ের সাজ সরঞ্জাম সাজিয়ে দিল সুন্দর করে, খটাশ করে পানিভর্তি একটা গ্লাস দিয়ে গেল এক ছোকরা—খাবারে মন দিলেন বাঘা মির্জা। কিন্তু একমনে খাওয়ারও উপায় নেই তাঁর, শুয়ে বসে কিছুতেই শান্তি নেই, সারাক্ষণ মনের মধ্যে পাক খায় রুস্তম শেখের চিন্তা। লোকটাকে গ্রেফতার করতে না পারলে যে ঠিক তিন মাসের মধ্যে তিনি পাগল হয়ে যাবেন সে ব্যাপারে তাঁর নিজের অন্তত কোনই সন্দেহ নেই। আর এ-ও তাঁর ভাল করেই জানা আছে, ওকে গ্রেপ্তার করা মুখের কথা নয়। গ্রেপ্তার হতে হতেও, এবং হয়েও বহুবার পালিয়ে গেছে সে আশ্চর্য কৌশলে। একবার তো পালিয়েছিল ছোট্ট এক নখ কাটবার কাঁচির সাহায্যে, একবার পালিয়েছিল ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, একবার কাপড়ের দোকানের পাশে রাখা বোরখা পরা মডেল সেজে, আর একবার পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে লোকজনকে টেলিস্কোপের সাহায্যে এমন এক ধূমকেতু দেখাবার ছলে। বুদ্ধির দিক থেকে নিজেকে রুস্তম শেখের চেয়ে কোন অংশে ছোট মনে করেন না আব্বাস মির্জা, কিন্তু নিজের অসুবিধে সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা রয়েছে তাঁর। তিনি জানেন স্রষ্টা শিল্পীর সাথে সমালোচকের কি প্রভেদ। রুস্তম শিল্পী, তিনি সমালোচক। দুটো দুই জিনিস। একজন নিত্য-নতুন উদ্ভাবন করছে একের পর এক, চমক লাগিয়ে দিচ্ছে তার সৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যে; আরেকজন তার দোষগুণ বের করে প্রশংসা বা নিন্দায় মুখর হচ্ছে। দুজনই দুজনের উপর

নির্ভরশীল: সৃষ্টি না হলে সমালোচনার কিছু থাকে না, আবার সমালোচনা না থাকলে সৃষ্টির বদলে অনাসৃষ্টির সমূহ সম্ভবনা দেখা দেয়।

এই সব ভাবতে ভাবতে সস্তা খাওয়া শেষ করলেন আব্বাস মির্জা, পট থেকে চা ঢাললেন কাপে, সামান্য একটু দুধ মেশালেন, দু'চামচ চিনি নিয়ে চামচ নাড়তে নাড়তে চাইলেন বাস স্ট্যান্ডের দিকে। নাহ্, মৌলভী ব্যাটার পাত্তা নেই কোথাও। ভোরে উঠেই রওনা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। এখন এই পুঁটলি নিয়ে কি করা যায় ভাবতে ভাবতে চায়ের কাপটা মুখে তুলেই চমকে গেলেন বাঘা মির্জা, চট করে কাপটা নামিয়ে রেখে কুঞ্চিত করলেন ঘন ভ্রূ-জোড়া। চিনির বদলে লবণ দিয়েছেন তিনি কাপে।

চিনির পাত্রটা পরীক্ষা করলেন আব্বাস মির্জা। নাহ্, আগরবাতিদান দেখে যেমন ভাতের থালা বলে ভুল করবার উপায় নেই, তেমনি নিশ্চিতভাবে এটা চিনিরই পাত্র। তা হলে ? চিনির পাত্রে লবণ রাখবার কী মানে? টেবিলের উপর স্থায়ীভাবে রাখা লবণের পাত্রটার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন তিনি এবার। ওটা যে লবণের পাত্র সে ব্যাপারেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। চট করে দু'আঙুলে টিপে খানিকটা লবণ তুলে জিভে ঠেকালেন তিনি। চিনি। এইবার সত্যিকার অর্থে সজাগ সতর্ক হয়ে উঠল বাঘা মির্জার পঞ্চ ইন্দ্রিয়। রেস্তোরাঁর চারপাশে চাইলেন কৌতূহলী চোখে। প্রায় ফাঁকা রেস্তোরাঁ, ধবধবে সাদা হোয়াইট ওয়াশ করা দেয়াল। দেয়ালের একটা জায়গায় কালচে দাগ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই পড়ল না তাঁর চোখে। ব্যাপার কি? সুগার বেসিনে লবণ, আর সল্ট সেলারে চিনি···এর অর্থ কী? কাপের গায়ে চামচ দিয়ে তিনটে টোকা দিয়ে ওয়েটারকে ডাকলেন তিনি। কাস্টোমারের বিরক্ত ভঙ্গি দেখে দ্রুতপায়ে এসে দাঁড়াল ওয়েটার। চিনির পাত্র থেকে চামচে করে খানিকটা লবণ তুলে এগিয়ে দিলেন তিনি ওর দিকে।

'খেয়ে দেখ। মুখে দিয়ে দেখ কেমন চিনি!'

আধ-চামচ লবণ মুখে দিয়েই প্রাগৈতিহাসিক গুহা-মানবের মত হয়ে গেল ওয়েটারের চেহারাটা। থু-থু করে মুখ থেকে ওগুলো ফেলে দিয়ে প্রথমে কুলি করল, তারপর নিতান্ত লজ্জিত ভঙ্গিতে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াল সামনে এসে। বোমা ফাটার অপেক্ষা করছে যেন সে।

'এই রসিকতার কী মানে?' জিজ্ঞেস করলেন বাঘা মির্জা। 'এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখ হলে এক কথা ছিল, বরের কাছে শালীদের পাঠানো শরবৎ হলেও আরেক কথা ছিল, কাস্টোমারদের সাথে এই তামাশার কী অর্থ?'

'আসাইয্যা!' একেবারে বোকা হয়ে গেছে ওয়েটার। আমতা আমতা করে বলল, 'নিচ্চয় ওই মওলানাগো কারবার। আপনে খারোন, আমি ম্যানাদাররে বোলাই।'

বোলাতে হলো না, ভাইরাসে আক্রান্ত বাম চোখ নিয়ে নিজেই এসে হাজির হলো ম্যানেজার, রক্তচক্ষু মেলে ধরল বাঘা মির্জার দিকে, 'কি উইছে, স্যার?'

'চিনির বেসিনে লবণ কেন? ঠাট্টা করছেন আপনারা কাস্টোমারদের সাথে?'

'আ মরো জ্বালা। দিল্লাগী করুম কেলেগা?' বলতে বলতে এক চিমটি লবণ

চেখে দেখল ম্যানেজার, পরমুহূর্তে ফায়ার হয়ে গেল ওয়েটারের উপর। 'ইটা কিমুন জাতের বিটলামী, সরিপ মিঞা? তামাশা করবার আর জাগা পাও নাই? তিনফুট তামাশা তোমারে বিরতে হান্দায়া দিমু আইজ আমি! যা-তা কথা নিকি? তোমার মথন...'

তোতলাতে শুরু করে দিল শরিফ মিঞা ভয় পেয়ে। দুজনকেই থামিয়ে দিলেন বাঘা মির্জা ছোটখাট এক গর্জন ছেড়ে। প্রশ্ন করে জেনে নিলেন আসল ব্যাপারটা। দু'জনের অসংলগ্ন বক্তব্য জোড়াতালি দিয়ে বোঝা গেল: সকাল আটটার দিকে দুইজন মৌলভী এসে এই টেবিলেই নাস্তা করে, একজন পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায় বাইরে, অপরজন তার মালসামান আর ছাতা সামলে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ কি মনে করে অর্ধেক খাওয়া চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে অবশিষ্ট চাটুকু ছুঁড়ে দেয় সদ্য চুনকাম করা দেয়ালের গায়ে। শরিফ মিঞা পিছু ধাওয়া করে ধরতে যাচ্ছিল 'হালা'দেরকে, কিন্তু এর মধ্যে দরবেশী কিছু ভেদ থাকতে পারে মনে করে ম্যানেজার তাকে নিবৃত্ত করে। তাছাড়া ততক্ষণে বেশ অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল 'হালা'রা, আর দোকানেও ছিল খরিদ্দারের ভিড়। লবণ-চিনির গোলমাল হয়ত তাদেরই কাজ হতে পারে।

মৌলভীদের চেহারার বর্ণনা জেনে নিয়ে, খাবারের দাম চুকিয়ে দিয়ে, ক্ষমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এলেন আব্বাস মির্জা দোকান থেকে। কয়েক গজ এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার। ছোট্ট একটা বিচ্যুতি ধরা পড়েছে তাঁর সতর্ক চোখে। রাস্তার ধারে একটা পানদোকানের পাশেই এক ডাক্তারের চেম্বার, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ডাক্তারকে, কিন্তু বাইরের নেমপ্লেটের পাশে 'ইন'-এর জায়গায় লেখা রয়েছে 'আউট'। পানদোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আঙুল তুলে নেমপ্লেটটা দেখালেন তিনি দোকানে বসা অল্পবয়সী ছেলেকে। 'ডাক্তার সাহেব নেই বুঝি চেম্বারে?'

আধ হাত লম্বা জিভ কাটল ছেলেটা। ধড়মড়িয়ে উঠে ঠিক করে দিল লেখা। জানাল, আছেন ডাক্তার সাহেব। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, যা সন্দেহ করেছিলেন তাই, ঘণ্টাখানেক আগে দুজন 'মলুই সাব' পান কিনেছিল তার দোকান থেকে। ডাক্তার সাহেব তার কিছুক্ষণ আগে পৌঁছেছিলেন চেম্বারে, নিজহাতে 'আউট' লেখাটাকে 'ইন' করেছিল সে, মনে আছে পরিষ্কার।

একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে ধীর পায়ে এগোলেন আব্বাস মির্জা বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছেন তিনি। সাধারণত যুক্তিতর্কের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে চলতেই তিনি অভ্যস্ত, কিন্তু যুক্তির সীমা সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা রয়েছে আব্বাস মির্জার। দৈবের উপর খুব একটা বিশ্বাস নেই তাঁর, কিন্তু দৈব ঘটনা যে ঘটে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এই সেদিনও হুবহু প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত একটা গাছ দেখেছেন তিনি নিজে। নেলসন যে তাঁর জয়ের মুহূর্তে মারা গিয়েছিলেন সেকথা কে না জানে? গতকালকের কাগজেই দেখেছেন তিনি অদ্ভুত এক সামুদ্রিক জন্তু পাওয়া গেছে সমুদ্র থেকে বহুদূরের এক জলাশয়ে। এসব কাণ্ড ঘটে। আশ্চর্যজনক হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। তেমনি মানুষের মধ্যে বিচার-বুদ্ধির বাইরেও যে ইনটিউইশন বলে একটা জিনিস রয়েছে,

তাকে কোন দিনই অস্বীকার তো দূরের কথা, ছোট করে দেখেন না তিনি। অবচেতন মনের সেই স্বতঃস্ফূর্ত বোধের দরজায় কেউ কড়া নাড়ছে, টের পাচ্ছেন তিনি স্পষ্ট। বুঝতে পারছেন, কিছু একটা তাঁর অবচেতন মন থেকে উঠে এসে ছায়া ফেলতে চাইছে চেতন মনের উপর, কিন্তু ঠিক কী তা বোঝা যাচ্ছে না। মনের ভিতর থেকে কিছু একটা প্রকাশ করতে চাইছে নিজেকে, কিন্তু শব্দ, কথা বা ছবি হয়ে ফুটে উঠতে পারছে না। এরকম আগেও হয়েছে বহুবার। এমতাবস্থায়, যখন কিছু ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না, কর্তব্য স্থির করা যাচ্ছে না, তখন নিজেকে পরিচালনার ভার অবচেতন মনের উপর ছেড়ে দিয়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়াই তিনি বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। যুক্তির পথ অনুসরণ করে যেখানে কোন সমাধানে আসবার উপায় নেই সেখানে অযুক্তিকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর উপায় কী? কোনও একখানে তো শুরু করতে হবে—মন যেদিকে টানে সেদিকে যাওয়াই ভাল। ঢাকায় এসে জানতে পেরেছেন উবে গেছে রুস্তম শেখ বেমালুম, মিশে গেছে হাওয়ার সঙ্গে। কাজেই আপাতত কাজ নেই হাতে। কীসের যেন একটা ইঙ্গিত পাচ্ছেন তিনি, ব্যাপারটা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এই ইঙ্গিতকেই অনুসরণ করবেন বলে মনস্থির করলেন আব্বাস মির্জা। সোজা গিয়ে তিনটে টিকেট কাটলেন তিনি কুমিল্লার, টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন হেড-অফিসের সঙ্গে, দুজন সহযোগীকে এক্ষুণি কমলাপুর বাস টার্মিনালের উদ্দেশে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার।

দশমিনিটের মধ্যেই ঘ্যাঁচ করে ব্রেক চেপে বাঘা মির্জার পাশে এসে থামল একটা পুলিস-জিপ। একজন ইউনিফর্ম, আর একজন সাদা পোশাক পরা ইন্সপেক্টার নামল জিপ থেকে। ইশারায় স্যালিউট করতে বারণ করে ওদের নিয়ে বাসে উঠে পড়লেন বাঘা মির্জা। দুটো টিকেট গুঁজে দিলেন দুজনের হাতে।

কেন, কোথায় চলেছে কিছু বুঝতে না পেরে উসখুস করছিল ইন্সপেক্টার দুজন, টিকেট হাতে পেয়ে বুঝতে পারল কুমিল্লার পথে চলেছে তারা। বাস ছেড়ে দিতেই সসম্মানে একজন বলল, 'জিপে করে গেলে অনেক আগেই পৌঁছানো যেত, ঝক্কিও কম হতো, স্যার।'

'তা ঠিক,' বললেন আব্বাস মির্জা। 'কোথায় যাচ্ছি সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে বাসের চেয়ে জিপই ভাল।'

'কুমিল্লা যাচ্ছি না আমরা?'

'ঠিক নেই।' আবার একটা সিগারেট ধরালেন মির্জা। ভুরুজোড়া কুঁচকে চিন্তা করলেন বেশ কিছুক্ষণ, তারপর প্রায় আনমনে বললেন, 'যাকে অনুসরণ করবে তার গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা থাকলে তার চেয়ে আগে বেড়ে থাকো, কিন্তু যদি তা না থাকে, যদি তার গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা করতে চাও, পেছনে থাকো। ও চললে তুমি চলো, ও থামলে তুমি থামো, ও যেমন ভাবে যেদিকে যাচ্ছে, তুমিও তেমনি ভাবে সেইদিকে চলো। এইভাবেই ও যা দেখেছে হয়ত তুমিও তাই দেখতে পারো, ও যা করেছে তুমিও তাই করতে পারো, এমন কী ও যা ভেবেছে হয়ত তা ভাবতে পারো। চোখ, কান, মন—তিনটেই খোলা রাখতে হবে তোমাকে; কোথাও সামান্য উদ্ভট বা বিসদৃশ কিছু চোখে পড়লেই সজাগ হয়ে লক্ষ

করতে হবে সেটা।'

এসবের কিছুই বুঝল না কোনও ইন্সপেক্টার। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ধরল বসের মুখের ওপর। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল একজন, 'কি ধরনের উদ্ভট জিনিস লক্ষ করব, স্যর?'

'সব ধরনের। অসাধারণ কিছু হলেই হলো। চোখে পড়ার মত।'

এই পর্যন্ত বলেই চুপ করলেন আব্বাস মির্জা। তাঁর অটল গাম্ভীর্য দেখে কেউ আর কোনও প্রশ্ন করতে সাহস পেল না। কিছু বলল না ঠিকই, কিন্তু এইভাবে কথা নেই বার্তা নেই হুট করে বাসে উঠে কুমিল্লার পথে রওনা হয়ে যাওয়াটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না ওরা, নিছক পাগলামি বলে মনে হচ্ছে। কে চলছে, কে থামছে, কার পিছনে কোন্ দিকে চলেছে ওরা বিন্দুবিসর্গ বুঝতে না পেরে বিক্ষুব্ধ মনে চুপচাপ বসে রইল দুজন। ব্যাপারটা খুলে বলবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না বাঘা মির্জার ভিতর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, মাইলের পর মাইল পথ সরে গেল পিছনে, কত লোক উঠল, কত নেমে গেল, গোঁ গোঁ ছুটছে বাস, যাত্রীদের টুকরো কথাবার্তা কানে আসছে—কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নেই যেন চীফ ইন্সপেক্টারের, জানালা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছেন তিনি ঠায়। দাউদকান্দি পেরিয়ে আরও সজাগ হয়েছে তাঁর দৃষ্টি, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন ইন্সপেক্টার দুজনকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন, রাস্তার পাশে হাট-বাজার বা লোকালয় পেলেই চষে ফেলছেন তিনি তাঁর তীব্র দৃষ্টি দিয়ে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল ছুঁই ছুঁই করছে, খিদেয় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবু পরোয়া নেই তাঁর। ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছাড়িয়ে কুমিল্লা শহরে প্রবেশ করল বাস, যতই এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে গাড়িঘোড়ার ভিড়, ততই কমছে বাসের গতি। হঠাৎ একসময়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বাঘা মির্জা, চিৎকার করে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে হুড়মুড় করে নেমে পড়লেন রাস্তায়।

ইন্সপেক্টার দুজনও নেমে পড়ল হতচকিত হয়ে। কেন নেমেছে বুঝতে না পেরে বাঘা মির্জার দিকে চাইতেই দেখল সগর্বে আঙুল তুলে একটা হোটেল দেখাচ্ছেন তিনি। নতুন হয়েছে হোটেলটা। ঝকঝকে। হোটেলের বাম পাশের এক অংশে একটা কাঁচের দরজার উপর ইংরেজিতে রেস্টুরেন্ট লেখা। সামনের সবটাই কাঠের ফ্রেমে ফ্রস্টেড কাঁচের টুকরো বসানো। সবই সুন্দর, সবই ঠিক আছে, শুধু একটা কাঁচের টুকরো কুৎসিত ভাবে ভাঙা। সেইদিকে পা বাড়ালেন আব্বাস মির্জা।

'ওই দেখো ইঙ্গিত,' খুশি খুশি গলায় বললেন তিনি। 'চলো, খাওয়াটা আগে সেরে নেয়া যাক, তারপর ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাবে।'

'কীসের ইঙ্গিত কিছুই তো বুঝতে পারছি না, স্যর,' বলল একজন ইন্সপেক্টার।

'আমিও না,' স্মিত হেসে বললেন বাঘা মির্জা। 'হয়ত দেখা যাবে আসলে কিছুই নয়, কিন্তু সামান্য কোন সূত্র বা আভাসও আমাদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে অনেক কাছে চলে এসেছি আমরা সত্যের।'

রেস্তোরাঁয় ঢুকে খাবারের অর্ডার দিলেন আব্বাস মির্জা। বারবার তাঁর চোখের দৃষ্টি গিয়ে স্থির হলো ভাঙা কাঁচের উপর, বড়সড় ঘরটার আর কোথাও কোন ইঙ্গিত বা আভাসের সন্ধান পেলেন না তিনি। খেতে খেতে ইন্সপেক্টার দুজনকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলেন কেন ওদের টেনে এনেছেন এতদূরে, কিন্তু বলতে বলতে নিজেই বুঝতে পারলেন হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে তাঁর বক্তব্য, কথাগুলো যুক্তিহীন ঠেকছে তাঁর নিজের কানেই। সবটা ব্যাপার এখন কেমন যেন ছেলেমানুষী বলে মনে হচ্ছে। মনে মনে লজ্জা পেলেন, কিন্তু মুখে সে-ভাব প্রকাশ না করে এমন একটা ভাব দেখালেন যেন নেহায়েত খেয়ালের বশে নয়, ওদের নিয়ে কুমিল্লার পথে পাড়ি জমানো তাঁর জন্যে অপরিহার্য ছিল।

খাওয়া শেষ করে গোটা দুই ঢেকুর তুলে একটা সিগারেট ধরালেন বাবা মির্জা, বিল শোধ করে পাঁচটাকা বকশিশ দিয়ে ফেললেন উর্দি পরা ওয়েটারকে। তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখালেন ভাঙা কাঁচটা।

'কাঁচটা ভাঙল কি করে?'

'আর কোয়েন না, স্যার,' বকশিশ পেয়ে একগাল হাসল ওয়েটার, ছোট্ট একটা সালাম ঠুকে বলল, 'পাগলের কারবার!'

'কী রকম?' সোজা হয়ে বসলেন আব্বাস মির্জা।

'দুই মোলুই সাপ আইছিল খানার লাই, এই দ, আদা গণ্টাও অয় নাই। খাইয়া লইয়া যাওনের সমো কাচটা বাইঙ্গা দিয়া গেল একজন।'

'তাই নাকি। এ তো বড় আশ্চর্য কথা! কী হয়েছিল খুলে বলো দেখি?'

জানা গেল, খাওয়া-দাওয়া হয়ে যেতে তস্তরি করে বিল এনে দিয়েছিল সে, লম্বাজন টাকা দিয়ে বেরিয়ে গেল পান কিনতে, বেঁটেজন ছাতা, ঝোলা আর হাতের দুটো প্যাকেট সামলাতেই তখনও ব্যস্ত। আট টাকার জায়গায় আটাশ টাকা কেন দিল মৌলভী সাহেব, বাকি টাকা তার টিপ্‌স্ কিনা, ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে যখন সে বুঝতে পারল যে মৌলভীদের পক্ষে এত টাকা বকশিশ দেয়া অসম্ভব, নিশ্চয়ই ভুল করেছে—ততক্ষণে দ্বিতীয় মৌলভীও দরজার কাছে চলে গেছে প্রায়। পিছু ডেকে ওয়েটার তাকে যখন জানাল আট টাকার জায়গায় ভুল করে আটাশ টাকা দিয়ে ফেলেছে, নূরাণী হাসি হেসে বিলটা ঠাহর করে দেখতে বলল তাকে মৌলভী। দেখে তো ওর চক্ষু চড়কগাছ। সত্যিই আটাশ লেখা রয়েছে তার উপর। অথচ ও কসম খেয়ে বলতে পারে নিজ হাতে আট টাকাই লিখেছিল সে বিলে। তখন মৌলভী সাহেব বলল: ঠিক আছে, বাকি টাকা দিয়ে ওই কাঁচটা সেরে নিয়ো। কোন্ কাঁচটা সেরে নেবে জিজ্ঞেস করায় ধাঁই করে ছাতার এক বাড়ি দিয়ে কাঁচটা ভেঙে দিল মৌলভী, বলল: এই কাঁচ। বলেই বেরিয়ে গেল বাইরে। বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে এক মিনিট, সংবিৎ ফিরে পেয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখল ডানদিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে গেছে ওরা দুজন, দোকান ফেলে রেখে আর ওদের পিছু ধাওয়া করা যায় না।

বর্ণনা শেষ হতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন আব্বাস মির্জা। ত্রস্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন রেস্তোরাঁ থেকে। প্যাঁচা মুখ করে পরস্পরের চোখের দিকে চাইল

দুই ইন্সপেক্টার। চাপা গলায় একজন বলল, 'পাগলের কারবার!' এই পাগল বলতে সে কাকে বোঝাল, মৌলভী না বাঘা মির্জা, সেটা আর পরিষ্কার করে বলল না, ছুটল দুজন বসের পিছনে। পড়ন্ত বিকেলের রোদে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

আধমাইল হেঁটে মূক-বধির এক লোকের মুদিদোকানের সামনে থেমে দাঁড়ালেন আব্বাস মির্জা। চাল, ডাল, লবণ, চিনি, আটা, পেঁয়াজ, আলু—প্রত্যেকটা জিনিসের দাম আলাদা আলাদা ভাবে কার্ডে লিখে গুঁজে দেয়া হয়েছে যার যার পাত্রে। বাঘা মির্জার তীক্ষ্ণ চোখে যে গোলমালটা ধরা পড়েছে বাকি দুজন সেটা লক্ষই করেনি, তাই অবাক হয়ে চাইল তারা বসের মুখের দিকে। সোজা গিয়ে চালের মধ্যে গুঁজে রাখা কার্ডটা বের করে মুদির চোখের সামনে তুলে ধরলেন তিনি। কার্ডটা দেখেই বিস্ফারিত হয়ে গেল মূক-বধির মুদির চোখজোড়া, প্রবল বেগে মাথা নাড়তে শুরু করল সে, উত্তেজিত হয়ে গোঙানির মত শব্দ বের করল মুখ দিয়ে। কার্ডে লেখা রয়েছে দেড় টাকা সের। এবার লবণের কার্ডটা টেনে তুললেন তিনি। সেটার উপর চোখ বুলিয়েই হাসি ফুটে উঠল গুংগার মুখে। তাতে লেখা রয়েছে: সাড়ে ছয় টাকা সের। অর্থাৎ এক কার্ড চলে গেছে আর এক জায়গায়। চট করে ভুল শুধরে নিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল সে। এবার হাতের ইশারায় বেঁটেখাট এক দাড়িওয়ালা লোকের খবর জানতে চাইলেন ওর কাছে বাঘা মির্জা। মুহূর্তে চটে উঠল লোকটা। ভুরু কুঁচকে আঙুল বাড়িয়ে আলুর টুকরির দিকে দেখাল, ইঙ্গিতে বোঝাল টুকরি উল্টে আলুগুলো সব রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়েছিল সেই লোকটা। হাতের কাছে পেলে পিটাবে সে তাকে। সেই লোকটা কোন্‌দিকে গেছে জানতে চাওয়ায় আঙুল তুলে ডানদিকের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল বোবা মুদি।

আর দাঁড়ালেন না আব্বাস মির্জা। প্রায় দৌড়ের মত করে ছুটলেন নির্দেশিত পথ ধরে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁর পিছু পিছু ছুটল বাকি দু'জন গোমড়া মুখ করে। মাইল দুয়েক চলার পর শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলেন বাঘা মির্জা। থেমে দাঁড়ালেন একটা কনফেকশনারী দোকানের সামনে। সবে ছায়া ফেলতে শুরু করেছে সন্ধ্যা। খোয়া বিছানো রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে উত্তরে। দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় টিলার ঢেউ। একটু ইতস্তত করে মন স্থির করে নিয়ে ঢুকে পড়লেন তিনি দোকানের ভিতরে। প্রথম কয়েকটা সেকেণ্ড কী জিজ্ঞেস করবেন বা কী কিনবেন বুঝে উঠতে পারলেন না বাঘা মির্জা, কিন্তু মুখ খোলার আগেই সমাধান হয়ে গেল সমস্যার। দরজার সামনে ইউনিফর্ম পরা পুলিসের লোক দেখে নিজেই কথা বলে উঠল অল্পবয়সী সেলসম্যান।

'ফ্যাকেটের লাইগা আইছেন দ? দিয়া দিছি আমরার মুহাজনরে। ওনায় নিজেই পৌঁচ্চায়া দিব।'

'প্যাকেট? কীসের প্যাকেট?' অবাক হলেন আব্বাস মির্জা।

'উট্টু আগে ওই যেইডা ফালাইয়া গেছিল্ মাওলানা সাবে। হেইডার লাইগাই আইছেন দ? দরবার শরীফে...'

'ব্যাপারটা খুলে বলো দেখি, ছোকরা। প্রথম থেকে।'

'এই দ, বিশ মিলিট ওইব, দুইজন মাওলানা আইসা কেক-বিস্কুট নিল হুজুর

শাক কেবলাজানের জইন্য, কিছুদূর গিয়া আবার ফিরা আইল একজন, জিগাইল এইগ্যা ফ্যাকেট পাইছি কিনা, কইলাম পাই নাই, কইল পাইলে য্যান কেবলাজানের দরবার শরীফে ফাডায়া দেই। মাওলানা সাবে চইলা যাওনের পর বালা কইরা খুইজ্যা দেহি সইত্যই ফালায়া গেছে এইগ্যা ফ্যাকেট। ইমুন সময়ে আমগোর মাহাজন আইস্যা হাজির। তানিয়ে কাইল পৌচ্চায়া দিব, তানিও দ হুজুরের মুরিদ, ওরস শরীফে...'

'শামসনগর কতদূর হবে এখান থেকে?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলেন বাঘা মির্জা।

'ছয়-সাত মাইলের কম না।'

'রাস্তা কি এই সোজা?'

'সিদা গিয়া এক বটগাছের তলে পাইবেন চৌরাস্তা। ডাইন দিকে পথ দিলে আর তিন মাইল। যারে জিংগাইবেন হেই...'

শেষটুকু না শুনেই প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন আব্বাস মির্জা। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সন্ধে ঘনিয়ে আসবে, তার আগেই দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে যতটা সম্ভব। ইন্সপেক্টার দু'জন বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে, কিন্তু চলার গতি বিন্দুমাত্র শিথিল করলেন না তিনি। বিশ মিনিট এইভাবে চলার পর এক টিলার মাথায় বিন্দুর মত দেখা গেল দু'জন চলন্ত মানুষকে। দূর থেকেও পরিষ্কার বুঝতে পারলেন মির্জা, দু'জনের মধ্যে একজনকে অসম্ভব বেঁটে লাগছে, এই লোকটাই সেই আপনভোলা মৌলভী হবে। আরও কিছুটা দূরত্ব কমিয়ে বুঝতে পারলেন, যদিও লম্বা মৌলভী যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে মাথাটা নুইয়ে হাঁটছে, লোকটার উচ্চতা কম করে হলেও ছয় ফুট হবে। ভিতর ভিতর মস্ত এক হোঁচট খেলেন বাঘা মির্জা। চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন আরও।

হঠাৎ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন আব্বাস মির্জা, সীলমোহর করা প্যাকেটের মধ্যে যে ওরসের ব্যয় বাবদ ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছে আপনভোলা বেঁটে মৌলভী, সেকথা তিনি যেমন জেনে ফেলেছেন, তেমনি রুস্তম শেখের পক্ষেও জেনে যাওয়াটা খুবই সম্ভব। সব খবরই তার কানে পৌছোয়। আর তাই যদি হয়, প্যাকেটটা বোকা মৌলভীর কাছ থেকে বাগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক। এবং সে-চেষ্টায় যে অতি সহজেই সে সফল হতে পারবে তাতেও তাঁর কোন সন্দেহ নেই। যে-কোন লোকের পক্ষেই এই সহজ, সরল, ভুলোমনের লোকটাকে নাকে দড়ি দিয়ে উত্তর মেরু পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ঢাকায় মৌলভীর ছদ্মবেশে দেখা গেছে রুস্তম শেখকে—তার অর্থ কি এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে না? এই টাকা কেড়ে নেয়ার পরিকল্পনা কী সে আগেই তৈরি করে রেখেছিল, নাকি অনুচরের কাছ থেকে খবর পেয়ে ভোরবেলা গিয়ে জুটেছিল কমলাপুর বাস স্টেশনে? পরিকল্পনা সে আগেই করুক বা পরেই করুক, ওই লোকটা যে রুস্তম শেখ সে ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ রইল না তাঁর মনের মধ্যে।

বৃদ্ধ মৌলভীর প্রতি তাঁর যতটা না করুণা হলো, তার চেয়ে অনেক বেশি রাগ আর ঘৃণা হলো রুস্তম শেখের উপর। এমন একজন সরল, ধর্ম-প্রাণ, অসহায় লোকের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেয়ার মত নীচতা তিনি রুস্তম শেখের কাছে ঠিক আশা করতে পারেননি। সহজ শিকারে যে শিকারী আনন্দ পায় আর যাই

হোক, তাকে বাহবা দেয়ার মত কিছুই থাকে না।

এতক্ষণ অবচেতন মনের নির্দেশে চলছিলেন, এবার সারাদিনের সব ঘটনাকে একটা সাধারণ যুক্তির সূত্রে গেঁথে নেয়ার চেষ্টায় মন দিলেন আব্বাস মির্জা। কিন্তু হোঁচট খেলেন প্রতি পদে। সারাদিনের ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনও যুক্তি, ছন্দ বা মিল খুঁজে পেলেন না তিনি কিছুতেই। সামনের এই লম্বা লোকটা হয়ত সত্যি রুস্তম শেখ, কিন্তু এক দস্যুর ঠগবাজি বা রাহাজানির সঙ্গে চা ঢেলে দেয়াল দাগিয়ে দেয়ার কী সম্পর্ক? তার জন্যে চিনি-লবণের পাত্র বদলেরই বা কী প্রয়োজন? ডাকাতির সঙ্গে চাল-লবণের দাম বদল, কিংবা আগে কাঁচের দাম দিয়ে পরে কাঁচ ভাঙার কি অন্তর্নিহিত নিগূঢ় সম্পর্ক থাকতে পারে? যুক্তির ভিত্তিতে কিছুই খাড়া করতে পারলেন না বাঘা মির্জা। মনে হচ্ছে, নাটক শুরু হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি, ঘুম ভেঙে দেখছেন শেষ পর্বে চলে এসেছে নাটক, কোনও মিল পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে। সাধারণত আসামীকে খুঁজে না পেলেও ক্লু বা সূত্র তিনি ঠিকই খুঁজে পান, কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো— আসামীকে পেয়েছেন তিনি হাতের মুঠোয়, কিন্তু সূত্র অনুপস্থিত।

বেশ অনেকটা কাছে চলে এসেছেন আব্বাস মির্জা। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে টের পেয়ে উৎসাহ আর উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে ইন্সপেক্টার দু'জনার মধ্যেও। বাঘা মির্জার পিঠে প্রায় বুক ঠেকিয়ে এগিয়ে চলেছে তারা। গজ ত্রিশেক সামনে গভীর আলোচনায় মত্ত অবস্থায় হাঁটছে মৌলভী দু'জন, তত্ত্বের এতই গভীরে ডুবে আছে যে আশপাশে কোনদিকে চাইছে না। সন্ধ্যা আর একটু ঘনিয়ে আসায় দূরত্ব আরও কিছুটা কমিয়ে আনলেন বাঘা মির্জা। কিন্তু তবু এক-আধটা সূরার ভগ্নাংশ ছাড়া কথার আর কিছুই বোঝা গেল না। বেশি কাছে চলে আসায় হরিণ-শিকারীর মত অতি সাবধানে, কখনও ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে বা বুকে হেঁটে এগোতে হচ্ছে তিন অফিসারকে। ছেলেমানুষের মত চিকন, সুরেলা কণ্ঠে কথা বলছেন বৃদ্ধ মৌলভী, 'রাব্বিল আ'লামীন', 'আস্ সাবউল মাসানী', 'কুরআনে আযীম', 'রবুবিয়াত' এই রকম টুকরো টুকরো শব্দ কানে আসছে। হঠাৎ একটা ঝোপঝাড় ছাওয়া ঢালু জায়গায় কয়েক মিনিটের জন্যে হারিয়ে গেল সামনের দু'জন। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল বাঘা মির্জার। শেষ গোধূলির আলো ম্লান হয়ে লেগে আছে পশ্চিম আকাশে মেঘের গায়ে। তারা ফুটতে শুরু করেছে একটা দুটো করে। নীচটা বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। আন্দাজে ভর করে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এলেন বাঘা মির্জা। কিছুদূর এগিয়ে কুলকুল শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে একটা ঝর্ণা দেখতে পেলেন তিনি। পরমুহূর্তে দেখতে পেলেন মৌলভী দু'জনকে। ঝর্ণার পানিতে ওজু করে মাগরেবের নামাজ আদায় করছে তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

নামাজের দৃশ্য দেখে মনটা দমে গেল আব্বাস মির্জার। তবে কি ভুল হলো কোথাও? তবু দুই সঙ্গীকে নিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে নামাজরত মৌলভীদের থেকে দশ গজ দূরে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে বসলেন হামাগুড়ি দিয়ে, নিঃশব্দে। ঠোঁটে আঙুল রেখে টুঁ শব্দ করতে বারণ করলেন সঙ্গীদের।

সালাম ফিরে মোনাজাতের জন্যে হাত তুললেন মৌলভীরা। মোনাজাত সেরে

তক্ষুনি উঠে পড়বার লক্ষণ দেখা গেল না তাঁদের মধ্যে, ঝর্ণার ধারে একটা গাছের গুঁড়িতে বসে ফুরফুরে হাওয়া খেতে খেতে আবার ফিরে গেলেন আগের আলোচনায়। তিন মিনিট আলোচনা শুনেই টের পেলেন আব্বাস মির্জা, মস্ত ভুল হয়ে গেছে তাঁর—এদের আধ্যাত্মিক আলোচনায় খাদ নেই কোন। গভীর তত্ত্বের মধ্যে ডুবে আছে দু'জন মোমিন মুসলমান। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল তাঁর। ঢাকা থেকে এতদূর ধেয়ে এনেছেন তিনি, এত কষ্ট দিয়েছেন সঙ্গী দু'জনকে.. এখন যদি তাদের বলতে হয় নিছক খেয়ালের বশে তিনি··· ছিঃ! আর ভাবতে পারলেন না বাঘা মির্জা।

মিটমিটি তারার দিকে চেয়ে ভাবে বিভোর কণ্ঠে বলে উঠলেন বেঁটে মৌলভী, 'আহা!' কি সুন্দর! সূরায়ে বাণী ইসরাঈলের পাঁচ রুকুতে আল্লাহ পাক বলেছেন: আমি এই কোরানে বহু বিষয়ের বিবরণ উল্লেখ করেছি, যেন সবাই তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ওরা যে আরও ভড়কে যাচ্ছে। আপনি (রাসুল) বলুন—তাঁর সঙ্গে যদি আরও কোন মাবুদ শরীক থাকত, যেমন তারা বলছে, তা হলে ওরা আরশের মালিকের দিকে পথ খুঁজতে নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়ত। তিনি পবিত্র মহান। ওরা যা কিছু বলছে সে সবের তুলনায় তাঁর মহিমা, মর্যাদা অনেক বেশি। সাত আসমান ও দুনিয়া আর এতে যা কিছু রয়েছে, সবাই তো তাঁরই পবিত্রতা জিকির করছে। এমন কোন জিনিস নেই, যা নাকি তাঁরই প্রশংসায় জিকির করছে না। কিন্তু তোমরা তাদের সেই জিকির বুঝতে পার না। তিনি তো সহিষ্ণু ও পরম ক্ষমাশীল। আপনি যখন কোরান তেলাওয়াৎ করবেন তখন আমি আপনার ও তাদের মধ্যে, যারা আখিরাতে মোটেই বিশ্বাস করে না, একটা পর্দা দিয়ে আবরণ সৃষ্টি করে দিই। তাদের অন্তরে পর্দা দিয়ে আবরণ সৃষ্টি করে দিই—যেন তারা বুঝতেই না পারে—তাদের কান ভারি করে দিই। আর আপনি কোরানের মধ্যে যখন আপনার পালনকর্তার কথা জিকির করেন, তখন তারা ঘাবড়ে ওঠে, পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। আমি বেশ জানি তারা যা শুনবার জন্যে কান পেতে বসে, আর যে মতলবে তারা শোনে, তা-ও জানি।'

কথাগুলো তাঁরই উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে কিনা ভেবে অস্বস্তি বোধ করলেন আব্বাস মির্জা। মনে হলো যেন তাঁকেই কিছু ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? দূর করে দিলেন চিন্তাটা।

'কিন্তু হুজুর, আমার প্রশ্নটা ছিল বিশ্বাস নিয়ে,' বলল লম্বা মৌলভী। 'আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করতে আমি খুব কম লোককেই দেখেছি। ঠিকই বলেছেন আপনি, সূরায়ে আনআমে চমৎকার ভাবে বর্ণনা আছে তার: জল-স্থলের ঘনঘোর অন্ধকার আর দুর্যোগের সময় আমরা সবাই একান্ত মনে তাঁকেই ডাকি, তিনিই আমাদের রেহাই দেন সেই সব অবস্থার কবল থেকে, বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত। কিন্তু যখন আমাকে লোকে প্রশ্ন করে: আল্লাহ্ বলুন আর যাই বলুন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এক মহা শক্তির দ্বারা—তাঁকে অস্বীকার করবার কিছুই নেই; তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে সুফল পাওয়া যায়, তাও মানি; তিনি রাব্বিল আলামীন, প্রতিপালন করেন; তিনি রহমানুর রহিম, অনুগ্রহ করেন; তিনি মালিকি ইয়াওমিদ্দীন, সব কাজের প্রতিদান ও কর্মফল দেন—কিন্তু তার

পরেও পরকাল আর কেয়ামতের উপর যদি আমার বিশ্বাস না আসে?—এর উত্তর কী দেব? পরকাল বা কেয়ামতের কোন প্রমাণ্ তো আর আমি তাদের দেখাতে পারছি না।'

হেসে উঠলেন বেঁটে মৌলভী। শিশুসুলভ খোলা হাসি।

'তাদের শুধু এইটুকুই বলতে পারেন, পরকাল আর কেয়ামতের বিশ্বাস আসলে তাদের অন্তরের মধ্যেই গোপন রয়েছে, অনর্থক যুক্তি-তর্কের ঢাকনি দিয়ে ঢাকা। ঢাকনি সরিয়ে দিলেই দেখতে পাবে সে সেটা। মানুষ কেউ মরতে চায় না, অথচ মৃত্যু হবেই। কিন্তু কেউ আসলে মেনে নিতে চায় না যে জীবনটা তার মৃত্যুর পরেই শেষ। এতদিন ধরে এত যত্নে এত সাবধানে যে অস্তিত্বটাকে টিকিয়ে রাখলাম, কেউ চায় না মৃত্যু এসে বিলুপ্ত করে দিক তার সেই প্রিয় অস্তিত্ব বা 'আমি'টাকে। চায়, আকার বদলে যাক, কিন্তু তবু থাকুক তার সত্তা। তাই আখিরাতের বিশ্বাস তার নিজেরই অন্তরের চাহিদা, এর সঙ্গে যুদ্ধ করে কারও কোন ফায়দা হয় না, জ্বে। তেমনি কেয়ামতের বিশ্বাসও মানুষের নিজের ভিতরেরই জিনিস। মানুষ দেখছে, যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে: জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, গাছপালা, বাড়িঘর—সবকিছু এগোচ্ছে লয়ের দিকে; শতচেষ্টা করেও কেউ ঠেকাতে পারছে না এসবের ধ্বংস। তার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে? দুনিয়ার সব কিছু নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে। দেখছি সবাই চোখের সামনে, কাজেই একদিন যে সব শেষ হয়ে যাবে তা বিশ্বাস করি আমরা অন্তরের অন্তস্তলে, মুখে স্বীকার করি বা না করি। আসল কথা কি জানেন, বাবা?—আল্লাহ্ পাক তাঁর কোন ধর্মগ্রন্থেই নতুন কোনও কথা বা ভাব আমাদের ওপর চাপাবার চেষ্টা করেননি, তিনি যা বলেছেন সেসব আসলে আমাদেরই মনের কথা, মনের গোপন বাসনা। ধর্ম জিনিসটা কী?—শান্তির পথ। যাতে শান্তি হয় তারই ব্যবস্থা রয়েছে এতে। শান্তি পেতে হলে বিশ্বাস আনতে হবে আপনার ধর্মে। অসহায় মানুষ জানতে চায় মরে গেলে কী হবে; সব ধ্বংস হয়ে গেলে কী হবে, তখনও কি আমি থাকব, এই আজাব থেকে বাঁচবার কোন পথ আছে কিনা···ধর্ম তাকে পথ দেখাচ্ছে। মানুষ যা বিশ্বাস করতে চায়, ধর্ম তাকে তো শুধু তাই বিশ্বাস করতে বলছে, তার বেশি তো কিছু নয়। কাজেই, যে বিশ্বাস করছে না সে তার নিজের বিরুদ্ধে নিজেই কাজ করছে, ধর্মের বা আল্লাহ্ পাকের তাতে কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, জ্বে।'

ঝোপের আড়ালে বসে দাঁত দিয়ে ঘন ঘন নখ খুঁটছেন চীফ ইন্সপেক্টার আব্বাস মির্জা। নিজের উপরেই খেপে গিয়েছেন তিনি আসলে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে কান দুটো। মানসচক্ষে সঙ্গী দু'জনের টিটকারির হাসি দেখতে পাচ্ছেন তিনি পরিষ্কার। আজকের এই ঘটনা নিয়ে কতদিন যে অফিসসুদ্ধ সবাই আড়ালে আবডালে হেসে বেড়াবে, ভাবতে গিয়ে গাল দুটো কুঁচকে উঠল তাঁর। এইসব ভাবতে গিয়ে লম্বা মৌলভীর বক্তব্য শুনতেই পেলেন না তিনি, আবার যখন মনোযোগ ওইদিকে ফেরালেন তখন কথা বলছেন বৃদ্ধ।

'···যুক্তির বাইরে কিছুই নেই, বাবা। সুম্মাস্ সাবীলা ইয়াস্সারাহু—অর্থাৎ কর্মপন্থা সহজ করাই সহজাত জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় শক্তির হেদায়েত। তকদীরের পরেই

এর স্থান। সৃষ্টির অস্তিত্ব দানের যে চারটে স্তরের বর্ণনা রয়েছে কোরান-পাকে, সেগুলো হচ্ছেঃ তাখ্‌লীক, তাস্‌ভিয়া, তাকদীর ও হেদায়েত। প্রকৃতি ঠিকই আপনাকে পথ দেখাচ্ছে, কিন্তু তার নির্দেশ অমান্য করে আপনি যদি চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি করেন, মানুষকে ঠকিয়ে নিজের সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেন, তার জন্যে শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে, জে।'

'সব সময়েই কি তাই?' লম্বা মৌলভীর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ কৌতুকের আভাস।

নিজের বোকামিতে যার-পর-নাই লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে নিঃশব্দে ঝোপের আড়ালে উঠে দাঁড়ালেন আব্বাস মির্জা। স্থির করলেন, এখন এখান থেকে চুপচাপ মানে মানে কেটে পড়াই ভাল, আর বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। রওনা হতে গিয়েও লম্বা মৌলভীর প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আভাস পেয়ে কান খাড়া করলেন তিনি থেমে দাঁড়িয়ে।

'সব সময়, জে।' উত্তর দিলেন সুপণ্ডিত মৌলানা। 'আজ হোক বা কাল। আল্লাহ্ পাকের ন্যায়বিচারের অর্থ এই নয় যে কেউ ভাল কাজ করলে সঙ্গে সঙ্গেই সে পুরস্কৃত হবে, বা কেউ অন্যায় করলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে শাস্তি পেতে হবে। তাঁর সব বিধানেই একটা অবকাশ, একটা দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ করবেন। তাঁর রহমত ভাল-মন্দ সবার উপরেই সমান। সবাইকে সুযোগ দেন তিনি। তিনি নিজেই বলেছেনঃ (হে রাসুল) বলে দিন, অপেক্ষা করো, নিশ্চয়ই আমিও তোমাদের সঙ্গে (স্বাভাবিক পরিণতি দেখা দেয়া পর্যন্ত) অপেক্ষা করব। আরেক জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ যেভাবে মানুষ স্বার্থ লাভের জন্যে তাড়াহুড়ো করে, তেমনি তাড়াহুড়ো যদি তাদের শাস্তি দানের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলা করতেন, তা হলে পাপী পাপ করে মুহূর্তকালও অবকাশ পেত না। সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত পরিণাম দেখা দিত। কিন্তু এটা তাঁর ইচ্ছে নয়। নিজেকে শুধরে নেবার সুযোগ দেন তিনি···যে সামলে নিল সে বেঁচে গেল, কিন্তু অপরাধীর শাস্তি হবেই।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লম্বা মৌলভী। রওনা হতে গিয়েও কেন যেন একটু অপেক্ষা করলেন আব্বাস মির্জা। লম্বা মৌলভীর বক্তব্য শোনার জন্যে, না আল্লাহ্ তা'আলার অপেক্ষা করবার বাণী শুনে, নাকি নীরবতার মধ্যে আর কিছু ইঙ্গিত উপলব্ধি করে—কেন, তা ঠিক বলতে পারবেন না বাঘা মির্জা, কিন্তু নড়তে পারলেন না তিনি জায়গা ছেড়ে।

'ভাগ্যিস অবকাশের ব্যবস্থা রয়েছে,' নিচু গলায় বলল লম্বা মৌলভী। 'নইলে অসুবিধে হয়ে যেত আমার।' আকাশের উজ্জ্বল তারাগুলোর দিকে চেয়ে তেমনি ভাব-গম্ভীর নিচু গলায় বলল, 'আপনার কাছে অনেক শিখলাম, মৌলানা সাহেব। হাজার শোকর। যখন সময় আসবে তখন মাথা পেতে নেব শাস্তি। কিন্তু আপাতত টাকার প্যাকেটটা বের করে দিন, হুজুর। এই নির্জন অন্ধকারে কারও কোন সাহায্য পাবেন না আপনি। আপনাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলার মত শক্তি আল্লাহ্ পাক দিয়েছেন আমাকে। কাজেই আশা করি কোন গোলমাল না করে প্যাকেটটা তুলে দেবেন আপনি আমার হাতে।'

চুপচাপ বসে রইলেন বৃদ্ধ মৌলানা। ব্যবহারে কোন চাঞ্চল্য বা ভাবের পরিবর্তন নেই। মির্জা ভাবলেন, বোকা মৌলভী বোঝেনি ব্যাপারটা কী ঘটতে

চলেছে। কিংবা বুঝতে পেরে পাথর হয়ে গেছে ভয়ে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল লম্বা মৌলভী। 'ঠিকই ধরেছেন, হুজুর। আমি রুস্তম শেখ।' কথাটা হজম করবার জন্যে কয়েক সেকেণ্ড সময় দিয়ে আবার বলল, 'প্যাকেটটা বের করে দিন, বুড়া মিঞা।'

'না,' শুধু একটা মাত্র শব্দ বেরোল সরল হতভম্ব বৃদ্ধের মুখ থেকে।

হেসে উঠল রুস্তম শেখ। নিচু গলায় হেঃ হেঃ হাসি। হাসি থামিয়ে বলল, 'দেবে না? মৌলানা সাহেবের মানে লাগছে বুঝি? নীতিতে বাধছে ওরসের টাকা ডাকাতের হাতে তুলে দিতে? গর্দভ বুড়ো! থাকলে তো দেবে? ও টাকা এখন আমার পকেটে!'

বিভ্রান্ত, সরল দৃষ্টিতে চাইলেন মৌলানা রুস্তম শেখের মুখের দিকে। একেবারে হতচকিত হয়ে গেছেন যেন তিনি। বললেন, 'আ-আপনার পকেটে! আপনি ঠিক জানেন?'

আনন্দে অট্টহাসি হেসে উঠল রুস্তম শেখ।

'জানি না মানে? তোমার মত বুড়ো হাবড়ার কাছ থেকে এটুকু হাত সাফাই করতে যদি না পারলাম, তা হলে আর সারাটা জীবন কি করলাম? ঠিক ওই রকম একটা ডুপ্লিকেট প্যাকেট বানিয়ে এনেছিলাম আমি, হাঁদারাম। বদল করে নিয়েছি। পুরানো কৌশল, এর মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই।'

'হ্যাঁ,' বললেন মৌলানা। আপন মনে আঙুল বুলালেন দাড়িতে। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা কাটেনি তাঁর এখনও। বললেন, 'হ্যাঁ, এই কায়দার কথা শুনেছি আমি।'

অবাক চোখে দেখল রুস্তম শেখ মৌলানাকে। কৌতূহলী ভঙ্গিতে খানিকটা ঝুঁকে এল সামনে।

'আপনি শুনেছেন। কার কাছে শুনেছেন এই কৌশলের কথা?'

'নামটা বলা ঠিক হবে না··· উচিত না,' সহজ কণ্ঠে বললেন মৌলানা। 'ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের মসজিদে বহু বছর ইমামতি করেছি আমি। হাজারো গল্প শুনেছি কয়েদীদের কাছে, বাবা। তাদের মধ্যে একজন ছিল হাত সাফাইয়ের কারিগর। কাজেই, বুঝতেই পারছেন, আপনাকে যেই সন্দেহ হলো, অমনি মনে পড়ে গেল তার কায়দার কথা, জ্বে।'

'আমাকে সন্দেহ হলো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল দস্যু। কণ্ঠস্বরে অভিভূত বিস্ময়। 'সন্দেহজনক কি করলাম আমি যে আপনার মত একজন গোবেচারা···'

'না, না, কিছুই করেননি, বাবা,' নিতান্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন মৌলানা। 'কোন কাজের জন্য নয়। আপনাকে দেখার সাথে সাথেই সন্দেহটা এসেছিল আমার মধ্যে। ওই যে হলেস্টার না কী যেন বলে···বগলের কাছে একটু উঁচু হয়ে থাকে, আর ওই বাম হাতের আস্তিনের কাছটা ফুলে থাকে ছুরির খাপের জন্যে···ওইসব দেখেই আর কী, বুঝলেন না···তাছাড়া কোমরে জড়ানো সাইকেলের চেন···'

আকাশ থেকে পড়ল রুস্তম শেখ। 'ইয়াল্লা মাবুদ! অ্যাঁ? সাইকেলের চেন, ছুরি, পিস্তল! এই লোক কোত্থেকে জানল এসব কথা!'

'সবাই বলত, শুনতাম। ওই সেন্ট্রাল জেলেই। সন্দেহ যখন এসেই গেল,

বুঝলেন না?—সাবধান হয়ে গেলাম। কারণ সবাই বলে দিয়েছে, খু-উ-ব সাবধানে নিয়ে যেতে হবে টাকাগুলো। কাজেই চোখ রাখলাম আপনার ওপর, তারপর, বুঝলেন না?—দেখলাম আপনাকে প্যাকেট বদলি করতে। দুই মিনিট পর আমিও বদল করে নিলাম ওটা আবার। ভয় পেয়ে ফেলে আসলাম ওটা পেছনে।'

'ফেলে আসলেন পেছনে! তার মানে?' রুস্তম শেখের কণ্ঠস্বর থেকে বিজয় গর্ব অদৃশ্য হয়েছে।

'জ্বে।' বিনীত হাসি হাসলেন মৌলানা সাহেব। 'কেক বিস্কুটের দোকানে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম একটা প্যাকেট ফেলে গিয়েছি কিনা। ছেলেটা বলল কিছুই ফেলে যাইনি। আমি নিজেও জানি কিছুই ফেলে যাইনি। তবু ওকে বললাম, যদি কোনও প্যাকেট পাওয়া যায় তা হলে যেন সেটা দরবার শরীফে পাঠিয়ে দেয়। আমি জানি, ওদের মালিক দরবার শরীফের একজন খাদেম, প্রাণ গেলেও ওরসের টাকা এদিক ওদিক করবে না সে।' বিষণ্ন হাসি হাসলেন মৌলানা। 'এই কায়দাটাও শিখেছিলাম আমি এক কয়েদির কাছে। লোকটা এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশন আর বড় বড় দোকানে ঘুরে বেড়াত; সুযোগ পেলেই হ্যাণ্ডব্যাগ, এমন কি এয়ারব্যাগ পর্যন্ত সরিয়ে ফেলত চট করে। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ হাতে রাখা বিপজ্জনক বলে এই কায়দায় কোন বন্ধুর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিত। সেই লোক এখন ওসব ছেড়ে দিয়ে আমাদের কেবলাজানের মুরিদ হয়েছে।' দাড়িতে আঙুল বুলালেন তিনি। 'অবকাশ পেয়েছিল সে, সুযোগ পেয়েছিল নিজেকে শুধরে নেয়ার, আল্লার রহমতে সে এখন মোমিন মুসলমান।'

পাগলের মত হাতড়ে ভিতরের পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করল রুস্তম শেখ, ফড়াৎ করে ছিঁড়ে ফেলল একটানে। ওর মধ্যে থেকে বেরোল একরাশ পুরানো খবরের কাগজ আর দুটো সীসের টুকরো। একলাফে উঠে দাঁড়াল সে বিশাল দৈত্যের মত। 'বিশ্বাস করি না! তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি! ছাতা সামলাতেই যে লোক হিমশিম খায় এত সব চালাকি তার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। তোমার কাছেই রয়েছে ওই প্যাকেট: ভাল চাও তো বের করে দাও ওটা, মৌলানা! নইলে জোর খাটাতে বাধ্য হব—একা ঠেকাতে পারবে না আমাকে, এখানে সাহায্যও পাবে না কারও। বের করো!'

'না,' বললেন মৌলানা। উঠে দাঁড়ালেন ধীরে-সুস্থে। 'জোর খাটালেও পাচ্ছেন না আপনি ওটা, বাবা। প্রথম কারণ, সত্যিই নেই ওটা আমার কাছে। দ্বিতীয় কারণ, আমরা এখানে একা নই।'

ঝাঁপ দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেল রুস্তম শেখ। মিষ্টি করে হাসলেন মৌলানা। হাত বুলালেন দাড়িতে।

'ওই যে ঝোপটা দেখছেন,' আঙুল তুলে আব্বাস মির্জা যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছেন সেইদিকে দেখালেন মৌলানা। 'ওর ওপাশে লুকিয়ে বসে আছেন দুইজন সহকারীসহ বাংলাদেশের···শুধু বাংলাদেশ বলছি কেন, গোটা উপমহাদেশের সেরা গোয়েন্দা জনাব আব্বাস মির্জা। বিশ্বাস না হয়, নিজে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, বাবা। যদি জিজ্ঞেস করেন এনারা কী করে এখানে

হাজির হলেন, আমি বলব, আমি দাওয়াত দিয়ে এনেছি। যদি জিজ্ঞেস করেন কীভাবে আনলাম, আমি বলব, আপনারই মত আরও অনেকের কাছ থেকে শেখা সহজ কৌশলে। রাগ করবেন না, বাবা, আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন, আপনার পাপ ক্ষমা করুন, আপনাকে সুপথে পরিচালনা করুন। পাবনা থেকে বাসে উঠেই যখন টের পেলাম আপনার লোক লেগে গেছে আমার পেছনে, মনের মধ্যে বড় আশঙ্কা হলো টাকাগুলো বুঝি আর হুজুরের দরবারে পৌছানো গেল না। কিন্তু চারপাশে ভালমত ঠাহর করে দেখি যাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের গৌরব জনাব বাঘা মির্জা। আভাসে টাকার কথাটা জানিয়ে দিলাম তাঁকে, কোথায় চলেছি জানালাম, আমি যে টাকাগুলোর হেফাজত করতে অক্ষম, জানালাম; তারপর ঢাকায় পৌছে সিটের ওপর একটা পুঁটুলি ফেলেই নেমে গেলাম বাস থেকে। আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু আপনাকে কোনদিন দেখিনি আমি, তাই ছোট ছোট কয়েকটা পরীক্ষা করে দেখলাম। পাছে পীরভাইকে বিপদে ফেলে কেবলাজানের বিরাগভাজন হই, সেই ভয়ে আগে বুঝে নিতে চাইলাম আপনার সত্যিকার পরিচয়। চায়ের মধ্যে চিনির বদলে লবণ দেয়া হলে মানুষ সাধারণত গোলমাল করে। কিন্তু যদি সে চুপচাপ সেই লবণ চা খেয়ে ওঠে, তা হলে বুঝতে হবে হৈ-চৈ না করার পেছনে তার জোরালো কোনও কারণ আছে। লবণ-চিনি বদলে দিলাম আমি, আপনি চুপচাপ খেয়ে উঠলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বেয়ারা যদি বিলের মধ্যে তিনগুণ বেশি দাম লিখে নিয়ে আসে, সাধারণত মানুষ গোলমাল করে, কিন্তু যদি সে ব্যাপারটা চুপচাপ হজম করে নেয়, তা হলে বুঝতে হবে হৈ-চৈ না করার পেছনে তার বিশেষ কোনও মতলব আছে। আট টাকার জায়গায় আটাশ টাকা বানিয়ে দিলাম আমি বিলটা, আপনি চুপচাপ টাকা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।' নূরাণী হাসি হাসলেন মৌলানা। 'আমি বুঝে নিলাম, আপনিই রুস্তম শেখ, জ্বে।'

ঝাড়া ছয়ফুট লম্বা রুস্তম শেখকে ছোটখাট মৌলানার পাশে বিশাল এক পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে সে মৌলানার উপর, ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে তাঁকে। কিন্তু এমনি জোর বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়েছে সে যে নড়তে পারল না এক পা-ও। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সম্মোহিতের মত।

'ইয়াল্লা!' বলল সে। 'সাধারণ এক গ্রাম্য মৌলভীর মুখে এসব কি শুনছি!'

আবার কথা বলে উঠলেন মৌলানা। 'চলার পথে কোনরকম সূত্র বা সঙ্কেত ফেলে যাওয়ার লোক আপনি নন, বাবা। কাজেই আমাকেই সে ভার নিতে হলো। যত জায়গায় নেমেছি বা থেমেছি, সবখানে কিছু না কিছু উদ্ভট কাজ করে এসেছি আমি। তাই বলে কারও এমন কিছু ক্ষতি করিনি—ফর্সা দেয়ালটা চা ঢেলে ময়লা করে দিয়ে এসেছি ঠিকই, কিন্তু বড়জোর ছয় আনার চুন লাগবে ওটা আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে, কাঁচ ভেঙে দিয়ে এসেছি ঠিকই, কিন্তু তার দামের ব্যবস্থাও করে দিয়েছি, আলুর টুকরি উল্টে দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু তাতে অলস লোক কাজ পেয়েছে, ক্ষতি হয়নি তার কিছুই। আসল কথা পীরভাইদের টাকা আমি দরবার শরীফে পৌছবার ব্যবস্থা ঠিকই করেছি। সবই আল্লাহ্ পাকের

মর্জি, অনন্তর তিনিই কৃপাময়, তিনিই ত্রাণকর্তা। তবে আমি ভাবছি, আপনি "ঘাইনাজারি" কায়দায় টাকাগুলো হাতাবার চেষ্টা করলেন না কেন।'

'কি কায়দায়?' জিজ্ঞেস করল রুস্তম শেখ।

'ও, এর কথা শোনেননি বুঝি, বাবা? ভাল। খুব ভাল। ওসব খুব খারাপ কথা, বাবা, না শোনাই ভাল। "ঘাইনাজারি" প্রয়োগ করলে আমি "আম্বিয়া" দিয়েও আপনাকে ঠেকাতে পারতাম কিনা সন্দেহ। বয়স হয়ে গিয়েছে তো, পায়ে আর জোর পাই না তেমন।'

'এসব কি বলছেন আপনি।'

'আমি মনে করেছিলাম "আম্বিয়া" সম্পর্কে ধারণা আছে আপনার, বাবা। থাক তা হলে আর শুনে কাজ নেই। ওসব দুষ্টলোকের কূট কৌশল। খুবই জঘন্য কাজ।' বিস্মিত দৃষ্টি বুলালেন মৌলানা রুস্তম শেখের পা থেকে মাথা পর্যন্ত। 'লোকে যতটা ভাবে, ততটা খারাপ তো হননি আপনি এখনও, বাবা?'

'কিন্তু এসব কায়দা কৌশল কোথায় শিখলেন আপনি, মৌলানা?' প্রশ্ন করল হতবুদ্ধি রুস্তম শেখ।

সহজ কণ্ঠে হেসে উঠলেন মৌলানা।

'আমি নিতান্তই সহজ, সরল, বোকা লোক। সবাই আমাকে সব কিছু বলে। সবাই মিলে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে নিয়েছে, বাবা। কিন্তু ছাতাটা আবার রাখলাম কোথায়!'

ছাতা আর ঝোলা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মৌলানা। তিন দিক থেকে ঘিরে ধরল রুস্তম শেখকে তিনটে ছায়া মূর্তি: একদিকে রিভলভার হাতে আক্কাস মির্জা, অন্যদিকে তাঁর সহকারী দুই ইন্সপেক্টর। বাধা দেয়ার চেষ্টা নিষ্ফল জেনে ব্যাপারটা সহজভাবেই নিল দস্যু-সম্রাট। মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল আক্কাস মির্জাকে। হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সামনে।

'আপনি সত্যি বাঘা মির্জাই বটে। বাঘের মত গন্ধ শুঁকে হাজির হয়ে গেছেন ঠিক সময় মত ঠিক জায়গায়। আপনার কাছে হারতে আমার লজ্জা নেই।'

'এসব বলে আমাকে আর সঙ্কোচের মধ্যে ফেলো না রুস্তম,' বললেন বাঘা মির্জা। 'তার চেয়ে এসো, আমরা দুজনেই প্রশংসা সত্যিই যাঁর প্রাপ্য সেই বুজুর্গ মাওলানাকে কদমবুসি করে তাঁকে ওস্তাদ বলে মেনে নিই।'

'আমি না, বাবা,' বললেন মৌলানা। 'আমি কিছুই না। সব প্রশংসা শুধু অল্লার জন্যেই। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমাকে লজ্জা দেয়ার চেয়ে আসুন, আমরা সবাই মিলে একবাক্যে বলি, আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন!'

ঝোলাটা কাঁধে তুলতে গিয়ে ঝপাৎ করে ছাতাটা পড়ে গেল মৌলানার।

***